জিহাদের পথে যা কিছু অপরিবর্তনীয়

শাইখ ইউসুফ আল উরাইয়ী রাহিমাহুল্লাহ

প্রতিটি আদর্শের ভিত্তি থাকে, এই ভিত্তিগুলোর কিছু আছে যা অপরিবর্তনীয় বা ধ্রুবক ।
আর কিছু আদর্শগত ভিত্তি পরিবর্তনশীল। অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলো স্থান, কাল, ব্যক্তিভেদে হেরফের হয় না।
অপরদিকে, পরিবর্তনশীল ভিত্তিগুলো সময় থেকে সময়ে, স্থান থেকে স্থানে, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে নানা রূপে
পরিবর্তন ঘটে থাকে। উদাহরণঃ আমরা কিভাবে সালাত আদায় করবো, এটা কি দেশ, যুগ বা ব্যক্তিভেদে
পরিবর্তনশীল ? না।

তেমনিভাবে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা রব্ব অপরিবর্তনশীল তথা চিরস্থায়ী এক সত্তা।
অপরদিকে পরিবর্তনশীল বিষয়ের একটি উদাহরণ হচ্ছে কিভাবে একজন ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা
যেতে পারে। আজকের দুনিয়াতে যা প্রয়োজন তা হল জিহাদের সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা, যা চিরন্তন
চিরস্থায়ী ও স্থান কাল পাত্র ভেদে অপরিবর্তনীয়। আমাদের প্রয়োজন সেই স্থায়ী ভিত্তিগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া,
এবং মানুষের মাঝেও তা প্রচার করা। বর্তমানে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ একদল লোক আবির্ভূত
হয়েছে যারা জিহাদ সম্পর্কিত এই স্থায়ী বিষয়গুলো পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করছে। তারা চেষ্টা করছে স্থায়ী
ভিত্তিগুলোকে পরিবর্তনশীল বিষয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করার এবং উদ্দেশ্য হল
যেন মানুষ তা অনুসরণ করে বিভ্রান্ত হয়।

**"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।
পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।
আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর।
বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন তোমরা জান না'।** (সূরা বাকারাহ ২১৬)

উবাদা বিন সামিত বর্ণনা করেছেন,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
“একজন শহীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাতটি পুরষ্কার লাভ করেন;
১) তাঁর রক্তের প্রথম ফোটা পতনের সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে
২) তিনি জান্নাতে তাঁর মর্যাদা দেখতে পারেন
৩) ঈমানের পোশাকে তাকে আচ্ছাদিত করা হয়ে থাকে
৪) তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়
৫) হাশরের ময়দানের ভয়াবহ চিন্তা-উৎকন্ঠা থেকে তিনি নিরাপদে থাকবেন
৬) তাঁর মাথায় একটি সম্মানের মুকুট স্থাপন করা হবে
৭) তিনি তাঁর পরিবারের সত্তর জন সদস্যের জন্য শাফায়াত করার সুযোগ পাবেন”

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, আত তারগিব ওয়া তাহরিব, পৃ ৪৪৩, খন্ড ২)

আল্লাহ যেন আমাদেরকেও শহীদদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেন, আমিন !

সম্পাদকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ আমাদেরকে এই বইটি প্রকাশের সুযোগ দান করে ধন্য করেছেন। বইটি সেই সব মু'মিনিন এর জন্যে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আহবানে সাড়া দিয়েছেন কিংবা দিতে ইচ্ছুক, আল্লাহ্ তায়ালা আহবান করে বলছেন, "মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য"। (সূরা সফ ১০-১২)

বর্তমান যুগের জিহাদ বিষয়ক শ্রেষ্ঠ বইগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি রচনা হচ্ছে *"ছাওয়াবিত 'আলা দারব আল জিহাদ"* শীর্ষক বইটি ।এটি রচনা করেছেন শাইখ ইউসুফ আল উরাইয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)। শাইখ ইউসুফ যুবক বয়সেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর ত্যাগ করেন এবং আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারা তাকে একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যিনি সকল ধরণের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন, একই সাথে তিনি একজন ভালো প্রশিক্ষক তথা ওস্তাদও ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আরব উপদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শীশান (চেচনিয়া) মুজাহেদিনদের সেবায় নিয়োজিত হন এবং তাদের জন্যে তহবিল সংগ্রহ করেন। কালের আবর্তে একসময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বেশ কয়েক বছরের জন্য কারাগারে আটক রাখা হয়। জেলখানায় থাকাকালীন সময়ে তিনি বুখারী এবং মুসলিম মুখস্ত করেন।

কারামুক্তির পর তিনি একাধিক বই রচনা করেন যার প্রত্যেকটি একেকটি মাস্টারপিস তথা কালোত্তীর্ণ রচনা। কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপন ও সাবলীল রচনা তাঁর লেখনীর গভীরতা বৃদ্ধি করেছে। একইসাথে বর্তমান যুগের ঘটনা প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের কারণে তাঁর রচিত বইগুলো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি পরবর্তীতে আরব উপদ্বীপে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হত্যার শিকার হন এবং শাহাদাত লাভ করেন (ইনশা আল্লাহ্) ; আমরা আল্লাহর নিকট তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করার জন্যে দুয়া করি। আমিন।

ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি এই বইটিতে যেন নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনি এই বইটির প্রতিটি অধ্যায়ের উপর বিশদভাবে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন।(বইটির পরিশিষ্টে ইমাম কর্তৃক সহজ সরল ইংরেজিতে আলোচিত সকল অডিওসমূহের ডাউনলোড লিংক সংযুক্ত করা আছে)। এই আলোচনাগুলো ধারাবাহিকতার সাথে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে কেননা বর্তমান সময়ে বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি হচ্ছে মুসলিম ইতিহাসের এমন একটি সময় যখন কোন খলিফা নেই এমনকি অনেক মুসলিম এও দাবী করছে যে, "এটা জিহাদের সময় নয়"। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে কারণ, অনেক মুসলিমেরই এ বিষয়ে কোন ধারণা নেই যে খিলাফা প্রতিষ্ঠা করা একটি দায়িত্ব। পরিহাসের বিষয়, এই মুসলিমদের অনেকেই এবং তাদের ইসলামিক আন্দোলনগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চায় ইসলাম, অথচ তারা কাজ করছে পশ্চিমা আদর্শ গ্রহণ করে এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করছে, পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা ইসলাম ও দীনকে বোঝার চেষ্টা করছে। আর এ কারণেই, তাদের মতে জিহাদ হল এমন একটি বিষয় যার চর্চা খুবই বিপদের কারণ !

তারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করছেন না, এই মুসলিমদের অনেকেই প্রচার করে যাচ্ছেন যে, আমাদের আরও ইমান ও ইয়াকীনের প্রয়োজন ! অথচ বাস্তবতা হল, যখন কোন মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আল্লাহর দিকে এক পা সামনে বাড়ায় তখন আল্লাহর উপর তার বিশ্বাস ও ভরসা বৃদ্ধি পায়। একথার সপক্ষে আমরা একটি হাদীসে কুদসীর কথা জানি যখন আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর দিকে এক কদম অগ্রসর হয় তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার দিকে আরো বেশি পরিমাণে অগ্রসর হন ! আবার, অনেকের মতে জিহাদ বলতে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে বোঝায় এবং এটা নাকি অন্য যে কোন সংগ্রামের চেয়েও বেশি। এই সবগুলোই জিহাদের সেই অর্থ যা বক্র এবং পশ্চিমা অপপ্রচারের ফলাফল, যদিও শব্দার্থ বিবেচনা করলে জিহাদ বলতে সংগ্রাম করাকেই বুঝিয়ে থাকে, এটা হলে ভাষাগত অর্থ। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে ইসলামিক পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর রাহে (ফি সাবিলিল্লাহ) লড়াই, মারামারি করা।

উদাহরণস্বরূপ, 'সালাত' এই শব্দটি আরবদের মাঝে ব্যবহৃত একটি সুপ্রাচীন শব্দ; এর অর্থ দুয়া। কিন্তু যখন ইসলামের আগমন ঘটল, তখন এই শব্দটির দ্বারা সেই প্রার্থনাকেই বুঝিয়ে থাকে যা আমরা দৈনিক পাঁচবার আদায় করে থাকি, অথচ ভাষাগতভাবে এর অর্থ কিন্তু 'দুয়া' হিসেবেই টিকে আছে। একই ঘটনা ঘটেছে *জিহাদ* এর ক্ষেত্রেও। পূর্বযুগে এই শব্দটি দিয়ে 'আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা' অর্থ নির্দেশ করার কিছুই ছিল না, কিন্তু যখন ইসলামের আগমন হল, তখন এটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম এই শব্দটির অর্থ বদল করে ফেলেছে। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, কুর'আনে অনেক আয়াতেই জিহাদ শব্দটি দিয়ে সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ইত্যাদিকেও বুঝানো হয়েছে; এবং এটা সত্য কুর'আনের অনেক আয়াতেই আমরা তা দেখতে পাই। কিন্তু সঠিক মত হচ্ছে, ইসলামের কারণে সামগ্রিকভাবে জিহাদের অর্থ নতুন মাত্রা লাভ করেছে, কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে

পুরোনো সাধারণ অর্থগুলো টিকে আছে। যেমন দেখুন এই হাদীসটির প্রতি, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ননা করেনঃ "যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি অথবা জিহাদের জন্য নিয়্যত করেনি এমন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"(মুসলিম)
এখানে কি নিজের "নফসের সাথে সংগ্রাম" অর্থ বুঝানো হয়েছে ? মোটেও না, আরেকটি উদাহরণ দেখুন,

ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, "যদি তোমরা আর্থিক লেনদেন এবং গরুর লেজ অনুসরণ কর এবং কৃষক হয়ে পরিতৃপ্ত– হয়ে যাও এবং জিহাদ প্রত্যাখ্যান কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা অবতরন করবেন যা ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (আবু দাউদ-সহীহ , অধ্যায় ২৩, নং ৩৪৫৫)

হাদীসটির অর্থ হল যদি মানুষ কৃষিকাজ এবং এর অনুরূপ কোন কাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার কারনে জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে ছেড়ে দেবেন; তাদের উপর লাঞ্ছনা বয়ে আনবেন এবং তা ততক্ষন পর্যন্ত দূর করা সম্ভব না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা তাদের দায়িত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তা শুরু করে এবং সেটি হল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা; তাদের ব্যাপারে কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়া; দ্বীন প্রতিষ্টিত করা; ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিজয় দেয়া এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি উর্ধ্বে উন্নিত করা এবং কুফর ও তার অনুসারীদের আবমাননা করা। এই হাদীসটি এটা তুলে ধরে যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হল ইসলাম ছেড়ে দেওয়া কারন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে"।

এখানে লক্ষ্য করুন, এই হাদীসটিতে জিহাদ অর্থে কি 'লড়াই বা যুদ্ধ করা' না বুঝিয়ে সাধারণ কষ্ট, চেষ্টা, সাধনা সংগ্রাম করা বোঝাচ্ছে ? এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হচ্ছে, আমাদের সাবধান করে দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যদি আমরা জিহাদ করা ছেড়ে দেই তাহলে আমাদের কি পরিণতি হতে পারে; বর্তমান যুগে আমরা জিহাদ সম্পর্কিত আকীদাহকে পরিবর্তনের অপচেষ্টা চালাচ্ছি আর এই জিহাদকে 'নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ'র নামে অপব্যাখা করছি, অথচ একচুল পরিমাণও আমরা একে লড়াই করা, ক্বিতাল করা ইত্যাদি অর্থে ব্যাখ্যা করতে রাজি নই ! আর এর ফলাফলস্বরূপ আমাদের উপর মুসলিম দেশে দেশে একের পর এক বিপর্যয়, লাঞ্ছনা আর অপমানজনক ঘটনা ঘটে চলেছে। লাঞ্ছনা আর অপমান বলতে কি বোঝানো হচ্ছে তা আর কাউকে নতুন করে ব্যাখা করার কোন দরকার নেই। এই অপমানজনক সময় আমরা বেশ দীর্ঘকাল ধরেই অতিক্রম করছি।

আল্লাহ্ মনোনীত এই দীনএর মর্যাদা তখনই টিকে থাকবে যখন আমরা সেভাবে ইসলাম অনুসরণ ও অনুশীলন করব যেভাবে করার জন্য আমাদের বলা হয়েছে, সেই প্রাচীন ইসলাম যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ পালন করে দেখিয়েছেন আর তা হল জিহাদের ঝাণ্ডা ধরে রাখা, চাই কোন খলিফা থাক বা নাই থাক। এই হাদীসটি মুসলিম জাতিকে আরো শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমাদের সাধারণ সিভিলিয়ানদের মত অলস আটপৌরে জীবন যাপন না করে পেশাদার সৈনিকদলের মতন লড়াকু জীবন গড়ে তুলতে হবে। এই বইটির পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হয়, "জিহাদের সমতুল্য কোন কাজ আছে কি?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তা করতে সক্ষম হবে না"। তৃতীয়বার তিনি বলেন, "মুজাহিদের সমতুল্য ঐ ব্যক্তি যে ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত রোযা রাখে এবং সালাহ পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই মুজাহিদ ফিরে আসে"। (সহীহ মুসলিম) অর্থাৎ ফিরে আসে, কথাটি দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসাই নির্দেশ করা হচ্ছে। আত্মার তথা নফসের সাথে যুদ্ধই যদি জিহাদ হতো তাহলে তা থেকে ফিরে আসার প্রশ্ন কেন আসবে ? এবং এই হাদীসটিতে নফসের জিহাদ থেকে ফিরে আসা একটি অর্থহীন প্রলাপ।

শুধু তাই নয়, যদি আমরা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত সালফে সালেহীনদের রচিত চিরায়ত ফিকহের বইগুলোর জিহাদ নামক অধ্যায়ের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব তাঁরা সাধারণত "কিতাব আল ক্বিতাল" নামে এই অধ্যায়টিকে আলাদা করেননি বরং নাম দিয়েছেন, "কিতাব আল জিহাদ" । উদাহরণস্বরূপ, ইবন কুদামাহ রচিত *আল মুগনি,* ইমাম শাফেয়ি রচিত *আল উম্ম,* ইমাম মালিক রচিত *আল মুদাওয়ানাহ,* যথাক্রমে আল খসরি, আলায়াশ এবং আল হাতাব রচিত তিন খণ্ডের *মুখতাসার খলিল,* ইবন হাজম রচিত *আল মুহালা, সুবুল আল সালাম, নায়ম আল আওতার,* ইবন তাইমিয়া রচিত *আল ফাতাওয়া আল কুবরা* ইত্যাদি।

এই দীনের যে একটি বিষয়কে কুফফাররা মনে প্রাণে সম্পুর্ণরূপে ঘৃণা করে তা হল জিহাদ। আপনাকে রমযানে সিয়াম পালন করতে কিংবা মসজিদে সালাত আদায় করতে দেখলে তাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু জিহাদরত অবস্থায় কোন মুসলিমকে দেখলে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

বর্তমান যুগে আবিষ্কৃত একটি শব্দ "টেররিজম" তথা "জঙ্গীবাদ" নামে মিডিয়াতে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তার অধিকাংশই জিহাদ। এই অপপ্রচারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আমাদের মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত এই অত্যাবশ্যকীয় এবং ফরয আদায় থেকে আমাদের সরিয়ে দেয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন

একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না"। (সূরা বাকারাহ ২১৬)

অন্তরের ব্যধিমুক্ত একজন সত্যিকারের ঈমানদারের জন্য নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি যথেষ্ট প্রমাণ, যেখানে বলা হচ্ছে জিহাদ হচ্ছে ইসলামের চূড়া , এবং এমন একটি আমল যা অন্য একটি আমল অর্জনের মাধ্যম হিসেবে করা হয় না কিংবা সেই পর্যায়টিতে চলে আসলে (খিলাফা) এই জিহাদের আমলটি শেষও হয়ে যায় না। জিহাদ নিজেই একটি ইবাদত যেমনটি রমযানের সিয়াম পালন করা নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবাদত।

মুয়াজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন, আমরা তাবুক হতে ফেরার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম তিনি আমাকে বললেন, "তুমি যদি চাও আমি তোমাকে সবকিছুর মূলবিষয়, এর স্তম্ভ এবং চূড়া সম্পর্কে বলতে পারি।" আমি বললাম, "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।" তিনি বলেন, "সব বিষয়ের প্রধান হল ইসলাম; এর খুঁটি হল সালাহ এবং এর চূড়া হল জিহাদ।" (বুখারী, আল হাকিম-আহমেদ-আল তিরমিযী ইবনে মাযাহ)

সালামাহ বিন নুফাইল বলেনঃ একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসেছিলাম তখন একজন ব্যক্তি তাঁর নিকট আসল এবং বলল, "হে আল্লাহর রাসূল ! ঘোড়াগুলিকে এখন অবজ্ঞা করা হচ্ছে এবং অস্ত্রগুলিকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে এবং কিছু লোক দাবী করছে যে, আর কোন জিহাদ নেই এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে"। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তারা মিথ্যে বলছে ! যুদ্ধ তো মাত্র শুরু হয়েছে ! যুদ্ধ তো মাত্র শুরু হয়েছে! এবং আমার উম্মাহর একটা দল সত্যের পথে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ কিছু লোকের অন্তরকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন এবং আল্লাহ্ যোদ্ধাদেরকে তাদের দ্বারা উপকৃত করবেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন চূড়ান্ত সময় সূচিত হবে এবং আল্লাহর শপথ পূর্ণ হবে এবং বিচার দিন পর্যন্ত ঘোড়াগুলির কপালে মঙ্গল নিহিত থাকবে। আমার কাছে এটা প্রকাশ করা হয়েছে যে আমি শীঘ্রই তোমাদের ছেড়ে চলে যাব (মৃত্যু) এবং তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে যখন তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং বিশ্বাসীদের ঘর হবে আল শামে। (আল শাম বলতে সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, জর্ডানকে বুঝায়। এটা দ্বারা দেশগুলোর অংশবিশেষ বা পুরোটাই বুঝানো হয়।) (নাসাঈ, হাসান)

আন নাসাঈর ব্যাখায় আল সিনধি বলেনঃ ঘোড়াগুলির অবমাননা বলতে বুঝায় তাদের অবজ্ঞা করা এবং তাদের গুরুত্বকে কম বা নীচু করে দেখা অথবা যুদ্ধে তাদের ব্যবহার না করা। 'এখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে; এখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে" কথাটি পুনরাবৃত্তি করার কারণ হল এর গুরুত্ব প্রকাশ করা এবং এর অর্থ হল যুদ্ধ কেবল প্রসারিত হচ্ছে

এবং আল্লাহ সদ্য এর আদেশ দিয়েছেন সুতরাং কি করে এটা এত তাড়াতাড়ি সমাপ্ত হয়? অথবা এর অর্থ হল প্রকৃত যুদ্ধ মাত্র শুরু হয়েছে কারণ এতদিন তারা তাদের নিজেদের রাজ্যের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছে- আরবের ভূমিতে; কিন্তু এখন সময় এসেছে সৈন্য নিয়ে দূরবর্তী ভূমিতে যাবার।

"আল্লাহ্ কারও কারও অন্তরকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন" এর অর্থ হল আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে কিছু মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ করে দেবেন যদিও এর দ্বারা কিছু মানুষের অন্তরকে ঈমান থেকে কুফরের দিকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়া লাগে তবুও। কারণ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে তাঁর জন্য যুদ্ধ করার এবং তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

"ঘোড়াগুলির কপালে মঙ্গল রয়েছে" এর অর্থ প্রতিদান এবং পুরষ্কার অথবা সম্মান এবং মহিমা।

"বিশ্বাসীদের ঘর হল আল শাম" এটি দ্বারা বোঝাচ্ছে যে, শেষ যমানায় এটি ইসলামের শক্তির কেন্দ্র এবং জিহাদের ভূমি হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পরীক্ষা এবং যন্ত্রণা তাদের পথে রয়েছে(অচিরেই শুরু হতে চলেছে)। পরীক্ষা যেন একটুকুরো আঁধার রাত। তাদের মাঝে সবচেয়ে নিরাপদ সেই ব্যক্তি যে গিরি উপত্যাকা বা পাহাড় চূড়ায় বসবাস করে, এক পাল ভেড়া নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, অথবা সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়া চরায় এবং তরবারীর উপর জীবিকা নির্বাহ করে।" (আল হাকিম) [এটা নির্দেশ করে যে বিশাল দুর্দশার সময় একজন লোকের হয় সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বেঁচে থাকা উচিত অথবা তার চেয়ে ভাল জীবন মুজাহিদ হিসেবে বেঁচে থাকা উচিত, (*আর আমরা কিনা বাস করছি মুশরিকদের মাঝে!*)] সুবহানাল্লাহ ! এই ফিতনার সময়ে আমরা (যারা দারুল হারব কিংবা দারুল কুফরে অবস্থান করছি তারা) কি করছি ?

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, মু'মিনদের মধ্যে কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার? তিনি উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর জন্যে জিহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তিও পূর্ণ ঈমানদার, যে পাহাড়ের কোন গুহায় নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় সে ঈমানের ক্ষতিসাধনকারী অসৎ লোকদের যাতনা হতে রক্ষা পায়। (আবু দাউদ ২৪৭৭)

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবীজীকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, "আমার উম্মতের জন্য মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই ঐরূপ ইবাদতের শামিল"। (২৪৭৮ আবু দাউদ)

অতএব, ফিতনার সময়ে তিনিই হবেন সবচেয়ে নিরাপদ মুসলিম যিনি নষ্ট দেশ ও নষ্ট সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে একটি জনবিরল অঞ্চলে নির্জনে বসবাস করবেন, আল্লাহর ইবাদত করবেন কিংবা সেই ব্যক্তি যিনি জিহাদে যোগদান করবেন এবং তাঁর তরবারীর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে জীবিকা অর্জন করবেন। এই দুইয়ের মাঝে আর কিছু নেই। কেউ হয়তো দাওয়াহ করার অজুহাত দিতে পারেন, যেটা শরীয়াহ অনুসারে একটি বৈধ কারণ বটে, কিন্তু সেই দাওয়াহ যেন নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াহ'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেই দাওয়াহ দিন আর রাতে বিরতিহীনভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আল্লাহর দীন প্রচার করে চলে। বাস্তব কথা হল, যেকোন ক্ষেত্রে যাকেই আমিরুল মু'মিনীন এর নির্দেশ মোতাবেক যখন অবিশ্বাসীদের দেশে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁরা আজকের গড়পড়তা অমুক-তমুক মুসলিমের মতন কেউ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুসলিমদের মধ্য হতে নির্বাচিত আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন আলেম।

আমরা আমাদের অবিশ্বাসীদের দেশে (দারুল কুফর কিংবা দারুল হারবে) নিজেদের অবস্থানকে বিচারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে পারি না কারণ, কোন আমিরই(খলিফা) আমাদেরকে আদেশ করেননি দাওয়াহ করার জন্য। আমরা আবার কি ধরণের দাওয়াহর উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি যদি আমরা নিজেরাই কুফফারদের জীবনধারা, কালচার অনুসরণ করে চলছি আর আমরা অজুহাত দিচ্ছি, *'এটা হচ্ছে ইসলামকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা'!*

এটা কি সাহাবাগণ আর সালাফদের কেউ করেছেন? তারাও কি আমাদের মত কুফফারদের চাওয়া পাওয়ার পিছনে ছুটেছিলেন? একজন সাধারণ অবিশ্বাসীর মতো কি তারাও দুনিয়ার পিছনে পড়েছিলেন? তাঁরা তো অমুসলিমদের সাথে মিল রেখে একটা পোশাক পর্যন্ত পড়েননি। তারা সমাজে অনন্য হয়ে অবস্থান করতেন। পশ্চিমা দেশে দাওয়াহ আমাদের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। আমাদের সবার আগে করণীয় হল নিজেদের দেশে মুসলিমদের সাহায্য করা, বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন জিহাদ প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফারদ, ফারদ আল 'আইন। আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য প্রয়োগ করে অবিশ্বাসীদের ভূমি ত্যাগ করে চলে আসা উচিৎ এবং নিজেদের মাটিতে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা উচিৎ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যেই কাফিরদের - সাথে যোগ দেয় এবং তাদের মাঝে বসবাস করে সে তাদেরই একজন।" (আবু দাউদ, তিরমিযি)

হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন , "সে সব মুসলমানদের ব্যাপারে আমার কোন দায়দায়িত্ব নেই -, যারা মুশরিকদের মাঝে (তথা অমুসলিমদের) বসবাস করে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহএর কারণ কি !? তিনি উত্তরে বললেন, ইসলামের অগ্নি এবং কুফরীর অগ্নি উভয়টি এক সাথে থাকতে পারেনা। কোনটি মুসলমানের আগুন, কোনটি অমুসলিমের আগুন তোমরা তা পার্থক্য করতে পারবেনা"। (তিরমিযি ,আবু দাউদ) * কেউ হয়তো বলতে পারেন, "আমার জন্মই হয়েছে পাশ্চাত্যে(তথা অমুসলিম প্রধান দেশে) কাজেই আমি কোথায় যাব ?" বেশ ভালো, আপনি যদি অবগত থাকেন যে, আপনার বসবাসকৃত পশ্চিমা দেশটি আর দশটা সাধারণ অবিশ্বাসীদের দেশ নয়, বরং তারা যুদ্ধক্ষেত্র এবং মিডিয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাহলে আপনার জন্য ফরয হবে সেখানে বসেই তাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করা কিংবা একটি মুসলিম দেশে হিজরত করে জিহাদে যোগ দেয়া। আবার অনেকে একথাও বলতে পারেন, "আরে আমাদের মুসলিম সংখ্যাপ্রধান দেশে ধর্মীয় নির্যাতন, জেল জুলুম থেকে পালিয়ে এখানে এলাম, এই দেশে তো স্বাধীনতা বেশি দিচ্ছে"।

এই অজুহাত দারুল কুফরে আগমনের জন্য কোন বৈধ কারণ নয়। প্রথমত, দারুল কুফর আপনাকে পরিপূর্ণভাবে কখনোই ইসলাম পালন করতে দেয় না। তারা কি আপনাকে জিহাদে অংশ নিতে দিবে? তারা কি আপনাকে আল্লাহর আইন হুদুদ দণ্ডবিধি কার্যকর করতে দিবে? তারা কি আপনাকে প্রকাশ্যে তাদের সমালোচনা করার অধিকার প্রদান করবে যে তারা মুজাহিদিন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ছে? যদি একটাও না হয়, তাহলে কি ধরণের ইসলাম পালনের স্বাধীনতা পেয়েছেন আপনি?

---

* এই হাদীসটার ব্যাখ্যায় এসেছে যে, তৎকালীন আরবে কোন গোত্র যখন মরুভূমিতেতাঁবু খাটিয়ে বা ঘর বানিয়ে বসতি স্থাপন করতো, তখন তারা তাদের বাসস্থানের সামনে রাতের বেলা মশালের মত আলো জ্বেলে রাখতো যাতে অনেক দূর থেকে তাদের বসতির অবস্থানটা বোঝা যায়।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএই হাদীসে বলছেন যে , মুসলিমদের এবং কাফির মুশরিকদের বসতি যেন পৃথক হয় এবং এমন দুরত্বে অবস্থিত হয় যাতে একটা থেকে অপর আলো পৃথক করা যায়।

আল্লামা খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের দেশে বসবাস করা জায়েয নেই। কেননা, অমুসলিমরা যখন পূজা-অর্চনার জন্য আগুন জ্বালাবে, সে সময় যেসব মুসলমান তাদের সাথে থাকবে, মনে হবে তারাও অমুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত। ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মুসলমান ব্যবসার উদ্দেশ্যেও যদি অমুসলিমদের দেশে গমন করে, তাহলে তার জন্য সেখানে বিনা প্রয়োজনে বেশি দিন বসবাস করা মাকরূহ। (মা'আলিমুস সুনান লিল খাত্তাবীঃ ৩/৪৩৭)

আল্লাহ বলেন, “তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন ! ” (সূরা বাকারাহ ৮৫)

দ্বিতীয়ত, যেসব মুসলিমরা প্রবাসী জীবন যাপন করছেন আর অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বাস করছেন, তাদের অনেকে বলছেন যে, আমাদের নিজ নিজ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যুলুম নিপীড়ন চলছে; তাহলে তাদের জন্য উচিত হল তারা সেই সকল অত্যাচারীদের ও মন্দ আমল কারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং কিছুতেই তাদের প্রতি নমনীয় বিগলিত মনোভাব দেখানো চলবে না যারা মুসলিম সংখ্যাপ্রধান দেশে একের পর এক কুফর আইন বাস্তবায়িত করে চলেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত কথা বলা হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ” (সুনান আবু দাউদ ৪৩৩০)

আর যদি আপনি জানেন যে, এই পদ্ধতিতে কাজ হবে না, তাহলে কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অত্যাচারী শাসকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ “আমরা কি তাদের প্রতিহত করব না?” তিনি বলেছিলেন, “না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তোমাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করে চলে”, মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলাম মোতাবেক শাসন করে। উবাদা বিন সামিত হতে আরও বর্ণিত আছে, শাসকের আনুগত্য ও বাইয়াতের ব্যাপারে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কিন্তু তোমরা যদি তাকে প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত দেখ, যে সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ বর্তমান রয়েছে (তখন আর কোন আনুগত্য নেই)”। (মুসলিম ৪৬২০)

আসুন, এক মুহুর্তের জন্যে শরীয়াহর আলোচনাকে তর্কের খাতিরে বাদ দিয়ে সুস্থ সাধারণ বিবেক দিয়ে চিন্তা করি। আজকে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এমন এক সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে বড় করে তুলছি যেখানে দিনে ও রাতে কুফর প্রচার করা হচ্ছে এবং তাকে শোভনীয় করে দেখানো হচ্ছে, আর সেই সন্তানদের ভবিষ্যত পরিণতি কি হতে পারে যারা বাস করছে দারুল কুফরে ? কি ভয়াবহ হতে পারে সেই পরিণতি যখন আমাদের পথভ্রষ্ট দেশ ও সমাজের কাছে হারাম, শিরক, কুফর, যিনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের নাম দেয়া হচ্ছে *‘বিনোদন’!* দারুল কুফরে বসবাসরত এই প্রজন্মের মুসলিমদের কি হচ্ছে একটু ভেবে দেখুন। তারা কি অমুসলিম জাতিদের অনুকরণ অনুসরণ করছে না? তারা কি তাদেরই মত একজন হয়ে যাচ্ছে না? আর এই লক্ষণ যে তাদের চেহারা (দাড়ি কামানো চকচকে গাল, বেপর্দা নারীদের চলাফেরা) কিংবা বাহ্যিক আচরণেও প্রকটভাবে ফুটে উঠছে তা কি আমরা দেখছি না? এমনকি যারা আজকে অবিশ্বাসীদের এই সকল কর্মকাণ্ড ও শক্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকার চেষ্টা করছে, কিভাবে তাদের প্রতি আমরা এই কথা বলতে পারি যে তারা তাদের নফসের কুফরের বিরুদ্ধে লড়াই

করছে ? অথচ তারা কি এই উন্মত্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সামগ্রিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে ঈমান নিয়ে টিকে থাকার মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে না যেখানে আজকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অমুসলিমদের চিন্তা চেতনা ও কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে? কেউ হয়তো বলতে পারেন, 'আমরা এই (দারুল কুফরে) দেশে বাস করছি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে। এখানে বসবাসের দ্বারা আমাদের নফস আরো শক্তিশালী হচ্ছে' !

যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া না দিয়ে অলস বসে আছেন, তাদের এ উক্তি নিজেদের অবস্থানকে বিচারের একটি চরম বেদনাদায়ক প্রচেষ্টা ছাড়া আর কি? আসল সত্য হচ্ছে, "আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক"। (তাওবা ৪৬)

"অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।
তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই।
যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও"। (নিসা ৭৭-৭৮)

এবারে আসুন দেখি, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য দারুল কুফরে এই উম্মাতের প্রথম তিন প্রজন্মের কেউ কিংবা সালাফগণের কেউ বসবাস করেননি। যদি তাঁরা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চাইতেন তাহলে তাঁরা অতিরিক্ত নফল সালাহ, কুর'আন তিলাওয়াত ইত্যাদি এবং এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন কাজ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'তে অংশ নিতেন। রমযানে সিয়াম পালন করার দ্বারা একজন বিশ্বাসী বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে ঠিক একইভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র দ্বারা একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, আর থাকবেই না কেন কারণ এই ইবাদতে যে সর্বদা মৃত্যুর ভয় থাকে। সে চায় তার নিয়ত বিশুদ্ধকরণের দ্বারা আমলসমূহকে কবুল মঞ্জুর করাতে এবং মর্যাদা ও পরিমানে বৃদ্ধি করাতে। যেহেতু এই বইটির সূচীতে হিজরতের উপর পৃথক আলোচনা বরাদ্দ করা হয়নি তাই এর শেষে একটি সংযোজন করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা কি পছন্দ কর না যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? তাহলে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর" (আহমাদ, তিরমিযি)

এর থেকে সহজ ব্যাখা আর কি হতে পারে? আল্লাহ যেন আমাদেরকে শহীদদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, আমিন !

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, "হে আল্লাহর রাসুল আমাকে এমন কাজ-এর নির্দেশ দিন যা জিহাদের সমতুল্য। " তিনি বলেন, "এমন কিছুই আমি খুঁজে পাইনা।" অতঃপর তিনি বলেন। "যখন মুজাহিদ জিহাদে যায়, তখন কি তুমি মসজিদে প্রবেশ করে অনবরত, কোন বিরতি না দিয়ে, সালাহ এবং রোযা রাখতে পারবে?" লোকটি বলেন, " কে সেটা করতে পারবে !" আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, " এমনকি একজন মুজাহিদের ঘোড়া দৌড়াতে থাকবে চারন ভূমিতে আর সেই ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য মুজাহিদকে পুরস্কার দেয়া হবে।" (বুখারী)

সুবহানাল্লাহ ! একজন মুজাহিদের মর্যাদা এত বেশি যে তার ঘোড়া যা কিনা চারণ ভূমিতে দৌড়াতে থাকবে আর তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য পুরষ্কার দেয়া হবে !

পরিশেষে, আমি আল্লাহর কাছে এই দু'আ করি যেন এই বইটি একটি ব্যবহারিক বইতে পরিণত হয়, যেন কেবল একটি ইলমের বই না হয়, অর্থাৎ আমরা যেন এই বইটি পড়ে সে অনুসারে আমল করতে পারি।

আমিন ইয়া রাব্বিল আলামিন !
ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

সূচীপত্র

খালিদ বিন আল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যদি আমি একটি সুন্দর মহিলাকে বিবাহ করি যাকে আমি ভালবাসি অথবা আমাকে একটি নবজাতক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় এটা আমার জন্য কম প্রিয় হবে সেই অবস্থার চেয়ে, যখন আমি এক বরফের ন্যায় ঠান্ডা রাত্রিতে একদল যোদ্ধার সাথে অবস্থান করছি পরবর্তী সকালে শত্র"র মোকাবেলা করতে আমি তোমাদের জিহাদে যেতে উপদেশ দেই।" (ইবনে আল মুবারক) এটা খালিদের মৃত্যুর আগের উক্তি।

মু'তার যুদ্ধে যখন একে একে মুসলিমদের পরপর দুইজন সেনাপতি শহীদ হলেন তখন তৃতীয় নেতা হিসেবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা মুজাহেদিনদের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। তাঁর একজন আত্মীয় ভাই একটি শুকনো গোশতের টুকরো দিলেন এবং তা গ্রহণ করতে বলে বললেন, "এটা খেয়ে শক্তি অর্জন করো। আজকের দিনে আমাদের উপর অনেক ধকল যাচ্ছে!" তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং একটিমাত্র কামড় দিলেন। এরপর তিনি নিজে নিজেই বলে উঠলেন, "তুমি এখনও এও দুনিয়াতেই পড়ে আছো !" এরপর গোশতের টুকরোটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে গেলেন এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন।

আবু মুছান্না আল আবাদি বলেনঃ আমি আবু আল খাসাইয়াহকে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম এবং বললাম যে, আমি তাঁর কাছে বাইয়াত দিতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাইয়াত গ্রহণ করলেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই' এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল' এই সাক্ষ্য দেয়ার, পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ পড়ার, রমযানে রোযা রাখার, যাকাত প্রদান করার, হাজ্জ করার এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার; আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলোর মধ্যে দুটি কাজ আমি করতে পারব না। প্রথমটি হল যাকাত দেওয়া; আমার মাত্র দশটি উট আছে। এটিই আমার সম্পূর্ণ সম্পদ। দ্বিতীয়টি হল জিহাদ। আমি শুনেছি যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দৌড়ে পালাবে সে আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে, আমার ভয় হয় যদি আমি যুদ্ধের সম্মুখীন হই হয়ত আমি মৃত্যুকে ভয় পাব এবং আমার নফস আমাকে ব্যর্থ করবে'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ধরলেন এবং বললেন, "সাদাকাহও না জিহাদও না! তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিভাবে?" আবু আল খাসাইয়াহ অতঃপর বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। (আল হাকিম কর্তৃক বর্ণিত এবং তিনি এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

জিহাদের প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে

জিহাদের প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে

সমগ্র পৃথিবী আজ ইসলামের একটি ইবাদতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, আর তা হচ্ছে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। অনেক জাতি বিশেষ করে যারা শক্তিশালী, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর বিরুদ্ধে লড়তে বিভিন্ন উৎস থেকে (সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, প্রচারমাধ্যম, জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, দল ইত্যাদি) জোর চেষ্টা করছে। ধর্মীয় শক্তির দিক থেকে দেখলে, আমেরিকা এবং ইসরাঈল ধর্মীয় কারণে ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্য একত্রে কাজ করছে, আর এর কারণটি হচ্ছে- মাসীয়াহর (ঈসা আলাইহিস সালাম) অবতরণ। রাজনৈতিক শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, সমগ্র পৃথিবীই আজ *ইসলামী জঙ্গীবাদ* দমন নিয়ে উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর প্রতিটি সরকারই মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ই রাজনৈতিকভাবে ইসলামের বিরূদ্ধে লড়তে (বিশেষ করে জিহাদের বিরূদ্ধে) একত্রিত হয়েছে। আর মিডিয়া সমস্ত জাতিকে ইসলামের আসল রূপ সম্পর্কে প্রতারিত করতে বেশ ভাল ভূমিকা রাখছে। তারা ইসলামকে এমন রূপে তুলে ধরছে, যা সত্যিই প্রতারণাপূর্ণ।

জিহাদের পূর্বে ''তারবিয়্যাহ' কি সত্যিই (জিহাদ না করার) একটি যৌক্তিক ওজর?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, **''তোমাদের জন্য কিতালের (যুদ্ধ) বিধান দেয়া হল, যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।''**

এই আয়াতে মুসলিমদের যুদ্ধ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। অনেক মুসলিম এবং ইসলামী জামা'আত বলে যে, জিহাদ করার পূর্বে, *তারবিয়্যাহ* অবশ্যক। তারা ব্যাপারটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন, *''তারবিয়্যাহ হচ্ছে জিহাদের পূর্বে অবশ্য পূরণীয় একটি শর্ত। অতএব, এটি ছাড়া জিহাদ করা যাবে না।''* যার মানে দাড়াচ্ছে যে, তারবিয়্যাহ জিহাদের পূর্বে অবশ্য পালনীয় হুকুম।

অন্যরা বলে, *''আমরা এখন মক্কী যুগের অবস্থায় আছি। অতএব এখন কোন জিহাদ নেই।''*
এটা কি যুক্তি সঙ্গত?

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ স্থগিত রাখার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে কি?

বুঝার সুবিধার জন্য এবার প্রশ্নটি একটু পরিবর্তন করা যাক। যদি কেউ রমাদান মাসে মুসলিম হয়, তবে কি আপনি তাকে বলবেন যে, রোযা রাখার পূর্বে তাকে তারবিয়্যাহ করতে হবে? তাকে কি বলবেন যে, আমরা এখন মক্কী অবস্থায় আছি অতএব, আপনাকে রোযা রাখতে হবে না? রোযা শুরু করার আগে আপনার ঠিক ১৫ বছর সময় আছে, কারণ সেই সময়ই রোযার আদেশ এসেছিল। অতএব, এর আগে রমাদানে একটি রোযাও না রেখে খাওয়া দাওয়া চালিয়ে যেতে পারেন। এটা আসলে কথার কথা। এমনটি কেউই বলে না।

তাহলে কেবল জিহাদের বেলায় কেন আমরা এমনটি বলি? এদের মধ্যে পাথর্ক্য কোথায়, যেখানে জিহাদের হুকুম ও সিয়ামের হুকুমের ধরণ একই?

"তেমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেয়া হল ...।"

"তোমাদের উপর ক্বিতালের বিধান দেয়া হল .।."

দু'টি বিধানই সূরা আল-বাকারায় এসেছে। 'তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল' এবং 'তোমাদের জন্য ক্বিতালের বিধান দেয়া হল'; তাহলে আমরা এদের মধ্যে পার্থক্য করছি কেন?

সত্যি বলতে গেলে, সিয়ামের বিধান জিহাদের পরে এসেছে।
সিয়ামের বিধান এসেছে নবুয়্যতের ১৫ বছর পর আর জিহাদের বিধান এসেছে নবুয়্যতের ১৩ বছর পর। এদের মধ্যে ২ বছরের পার্থক্য কেন? অতএব, যুক্তিসঙ্গত কথা বললে, আমাদের বলতে হয়, সিয়াম পালনের পূর্বে তারবিয়্যাহ করতে হবে। **আমরা কিভাবে জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহ্র পূর্বে তারবিয়্যাহ বিধান দেই,যেখানে রসূল ﷺ তা করেন নি?** যখন কেউ মুসলিম হত, তিনি কি তাকে শাইখদের কাছে পড়তে বলতেন এবং এরপর সে জিহাদ করার উপযুক্ত হত? তিনি কি বলতেন জিহাদ করার পূর্বে তোমার আরবী শিখতে হবে অথবা বিদেশে গিয়ে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করে আসতে হবে?

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ ''আমর ইবন উকায়শ প্রাক-ইসলামী যুগে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়েছিল, সেই টাকা ফেরত নেয়ার পূর্বে সে ইসলাম কবুল করাটা অপছন্দ করল। উহুদের (যুদ্ধের) দিন সে এসে জিজ্ঞাসা করলঃ 'আমার অমুক ভাই কোথায়?' তারা উত্তর দিলঃ 'উহুদে,' সে জিজ্ঞাসা করলঃ 'অমুক কোথায়?' তারা বললঃ 'উহুদে', সে জিজ্ঞাসা করলঃ 'অমুক কোথায়?' তারা বললঃ 'উহুদে' অতঃপর সে তার জামা পড়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল, এরপর তাদের দিকে এগিয়ে চলল। মুসলিমরা যখন তাকে দেখল, তারা বলে উঠল, 'দূরে থাক, আমর', সে বলল, 'আমি মুসলিম হয়েছি' সে আহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করল। অতঃপর তাকে আহত অবস্থায় তার পরিবারের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। সা'দ ইবন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বোনের কাছে এসে বললঃ 'তাকে জিজ্ঞাসা কর তো (সে কিসের জন্যে যুদ্ধ করেছে) গোত্রের জন্য, তাদের ক্রোধের ভয়ে, নাকি আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে।' সে বললঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ক্রোধের ভয়ে।' এরপর সে মৃত্যুবরণ করল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল। সে আল্লাহর জন্য কোন (এক ওয়াক্ত) সলাতও আদায় করেনি।''

যখন সে মুসলিম হয়েছিল, রসূল ﷺ কি তাকে কুরআন ও হাদীস পড়তে বলেছিলেন? উকাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুই করেনি, কেবল আল্লাহর পথে জিহাদ করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। একজন মুসলিমের পক্ষে সর্বোচ্চ যে মর্যাদা তাই সে অর্জন করেছিল।

অথচ কিনা তিনি ছিলেন একজন ইহুদী যিনি কিনা সুদের পাওনা টাকা হাতে না পাওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করতে পর্যন্ত রাজি ছিলেন না ! একজন ইহুদীর চেয়ে অধিক তারবিয়্যাহ আর কার দরকার হতে পারে?

মানুষ বলে জিহাদের পূর্বে বেশি তারবিয়্যাহ দরকার।

বুখায়রীক উহুদের ময়দানে মুসলিম হয়েছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। রসূল ﷺ বলেনঃ ''বুখায়রীক ইহুদীদের মধ্যে সর্বোত্তম।'' সে কোন আত্মিক উন্নয়নের প্রশিক্ষণ নেয়নি। তারপরও রসূল ﷺ তাঁকে ইহুদীদের মধ্যে সর্বোত্তম আখ্যা দিয়েছেন। কেন? কারণ সে ময়দানে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন।

এটা তারবিয়্যাহকে ছোট করে দেখার জন্য নয়, কিন্তু যখন একে আমরা জিহাদের সাথে অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে জুড়ে দেই, তখন দেখা যায় যে, এটা আসলে জরুরী নয়।

তাহলে, কেন মুসলিমদের জিহাদের পূর্বে তারবিয়্যাহ প্রয়োজন বলে কিছু মানুষ দাবী করছে?

কারণ আল্লাহ মহামহিম বলেন, ''তোমাদের জন্য ক্বিতালের বিধান দেয়া হল এবং তোমরা তা অপছন্দ কর ...।'' - এটাই কারণ। কারণ মানুষ এটা অপছন্দ করে এবং এর থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন উপায় বের করতে থাকে।

অতএব তারা বলে যে, আমাদের তারবিয়্যাহ দরকার অথবা শত্রুপক্ষ বেশি শক্তিশালী। এটা মানুষের ফিতরাতের অংশ। আল্লাহ্ তাই বলেছেন। যুদ্ধের বাস্তবতাটা এরকমই যে বেশিরভাগ মানুষই তা অপছন্দ করে। সাহাবীদের সময়ও এমন ছিল, এখনও তাই আছে।

সালাহউদ্দিনআইয়ুবীرحمه الله -এর সময়কার কিছু উলামাঃ

সালাহউদ্দিন আল-আয়্যুবী رحمه الله -এর সময় , তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য সেচ্ছাসেবকদের আহবান করলেন এবং এর ফলে কিছু শাইখ ও তাদের ছাত্ররা যোগদান করল। খবর ছড়িয়ে পড়ল যে ক্রুসেডাররা সমগ্র ইউরোপ থেকে সেনাবাহিনী সমাবেশ করেছে। তখনকার দিনের তিন শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে তিনটি বাহিনী এগিয়ে আসছিল। রিচার্ড দ্যা লায়ন হার্ট (সিংহ হৃদয়), ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ এবং জার্মানীর রাজা ফ্রেডরিক। ফ্রেডরিকের একারই ৩,০০,০০০ সৈন্য ছিল (৩ লক্ষ)।

অতএব, যখন উলামারা এ খবর জানতে পারল, তারা সেনাবাহিনী ত্যাগ করে চলে গেল। এসব উলামাগণ তো জানত যে তাদের লড়াই করা উচিত। তারা জানত, এ ব্যাপারে কি হুকুম আছে। কিন্তু হুকুমের কথা জানা মানেই এই না যে কেউ যুদ্ধ করবে।

আল্লাহ আহকামুল হাকীমিন বলেনঃ **"তাদেরকেঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন অতঃপর সেতাকে বর্জন করে পরে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়আর সে বিপথগামীদেরঅন্তর্ভূক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতোরতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায় তার উপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবতুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যানকরে তাদের অবস্থাও এইরূপ তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে।"**

এটা এমন একজন আলিমের কাহিনী যে হুকুম জানতো, কিন্তু তা মেনে চলেনি। কেন? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ *"কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।"* আল্লাহ্ তাকে **কুকুরের** সাথে তুলনা করেছেন। অতএব, কেবল জ্ঞান থাকাই পরিত্রাণ পাবার উপায় নয়। সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে হবে। বেশিরভাগ মানুষই এই অবস্থানে এসে বলে যে, তাদের কাছে এই বিষয়ের উপরে কোন ফাতওয়া নেই;

অতএব তারা কিছু করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এটা কিয়ামতের দিন তাদেরকে বাঁচাবে না। যদি আপনি জানেন যে এটাই সত্য, তাহলে আপনাকে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে, কোন আলিম তা অনুসরণ করুক আর না করুক।

আহলে কিতাবীদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কঃ

কিছু মানুষ বলে যে, আহলে কিতাবীদের সাথে আমাদের শান্তি এবং মতামত আদান-প্রদানের ভিত্তিতে সম্পর্ক হওয়া উচিত ।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ **"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌-তে ঈমান আনে না ও শেষদিনেও না এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযয়া দেয়।"**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেনঃ **"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সলাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**

এই ধরনের ইবাদতকে *সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গীবাদ* এবং এর অনুসারীদের *সন্ত্রাসী, জঙ্গী, উগ্রপন্থী, মিলিশিয়া* ইত্যাদি নাম দিয়ে কাফিররা এর বিরুদ্ধে লড়ছে। আর মুনাফিকরা তাদেরকে নিম্নোক্তভাবে সাহায্য করে আসছে-

১) তারা বলে যে, জিহাদ কেবলই আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক নয় !
২) জিহাদ কেবলই একটি মুসলিম অঞ্চল বা রাষ্ট্রকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য !
৩) জিহাদ কেবল মাত্র ইমামের অনুমতি ও নির্দেশ অনুযায়ী করা যাবে !
৪) জিহাদ বর্তমান বিশ্বব্যাপী শান্তির সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয় !

দুঃখজনকভাবে, আমাদের আলিমগণ জিহাদ সম্পর্কিত এ সমস্ত ভুল তথ্যাবলী প্রচার করছে।

আমরা **পশ্চিমা মত অনুযায়ী** জিহাদের ব্যাখ্যা কেন করব, যেখানে রসূল ﷺ-এর হাতে গড়া **সাহাবাদের থেকে** আমরা জিহাদ বুঝতে পারি? আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ আমাদেরকে জিহাদ মানে কি তার শিক্ষা দিয়েছেন, তাই এ বিষয়ের উপরে কোন অমুসলিম অথবা তথাকথিত মুসলিম পুতুল সরকারের উপদেশ বাণী আমাদের দরকার নেই।

কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে- এ ব্যাপারে প্রাথমিক দলিল সমূহঃ

কিয়ামত না আসা পর্যন্ত জিহাদ বন্ধ হবে না- আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের এটা জানিয়ে দিয়েছেন। এর প্রমাণ কী?

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ **"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।"**

এ আয়াতে একটি ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে **'সুন্নাহ রববানিয়্যাহ'**। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র একটি সুন্নাহ যা চিরস্থায়ী। আর এখানে সেই চিরস্থায়ীটি হচ্ছে **'প্রতিস্থাপন'** সংক্রান্ত। যারাই তাদের দায়িত্ব পরিত্যাগ করবে, **আল্লাহ্ তাদের প্রতিস্থাপন করবেন**, তারা যেই হোক না কেন। মনে রাখবেন, এই আয়াতটি **সাহাবাদের উদ্দেশ্যে** নাযিল হয়েছিল। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ কারও সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন না। ইহুদীরা ভেবে নিয়েছিল যে তারা আল্লাহর *'মনোনীত দল'* এবং এরপর তারা তাদের দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ্ তাদের অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত করেন।

অনেক ইসলামি জামা'আত বলে থাকে যে তাদের জামা'আত ২০-৩০ বছর ধরে টিকে রয়েছে। অতএব, তারাই সরল সঠিক পথের উপর রয়েছে। এটা মোটেও ঠিক নয়। যেই মূহুর্তে আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিত্যাগ করবেন, আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিস্থাপন করবেন। শেষে যে কাজটি আপনি করেছেন বা করবেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সেই কাজের উপর মৃত্যুবরণ করেন, ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, তাই বিচার দিবসে আপনার অবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাপ করা অবস্থায় মৃত্যু ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয়।

অনেক মানুষই একটিপ্রশ্ন করে যে 'চারদিকে এত ইসলামী দল, আমরা কোনটাতে যোগ দিব?'

আমরা যদি ঠিক জায়গায় দেখি, তাহলে আর বিভ্রান্ত হব না, বরং আমাদের উত্তর খুঁজে পাব। রসূল ﷺ আমাদের আত-তায়ীফা আল-মানসূরাহ (বিজয়ী দল) সম্বন্ধে বলেছেন । তিনি শুধু আমাদের এটুকুই বলেননি যে তারা বিজয়ী, বরং তিনি এই বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্যগুলোও বলে দিয়েছেন। যে কেউ এই বৈশিষ্ট্যগুলো শুনবে সে আর উপরোক্ত প্রশ্নটি করবেন না। কুরআনে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলো দিয়েই শুরু করা যাক। (সূরা মায়িদাঃ ৫৪) নং আয়াতে আল্লাহ্ তোমাদের স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিস্থাপন করবেন তাদের দ্বারাঃ-

১) 'আল্লাহ্ যাদের ভালবাসেন'

২) 'তারা আল্লাহকে ভালবাসবে'

এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কখনই হয়ত জানতে পারব না, কারণ এগুলো সবই আমাদের কাছে অদৃশ্য। কিন্তু যদি কেউ তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পন্ন করে, তবে তারাই সেই সব ব্যক্তি যাদের আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহেক ভালবাসে।

৩) 'তারা মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হবে'

এর অর্থ তারা মু'মিনদের ভালবাসে, তাদের জন্য উদ্বিগ্ন। মুসলিমদের ঘটনাগুলো নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন হবে। সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের সাথে কি ঘটছে, সেই খবর তারা রাখে। পৃথিবীর যেকোন জায়গায় যে মুসলিমই থাকুক, সে তাদেরই ভাই, তাদেরই বোন। যদি পশ্চিমে বসবাসকারী কোন মুসলিম শুনে যে পূর্বের কোন মুসলিম ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে রক্ষা করা তারই দায়িত্ব বলে মনে করে। এই ভাইয়েরা, যখন শুনে যে তাদের ভাই-বোনদের সাথে খারাপ কিছু হচ্ছে, তখন তারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং সত্যিই সেখানে যায়। তারা মু'মিনদের রক্ষা করতে **নিজের জীবন দিয়ে দিতে রাজী** নিজেদের টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি খরচ করে তাদের ভাইদের, ঈমানদারদের রক্ষা করতে তারা রাজী।

অপরদিকে, আমরা দেখি যে, এমন অনেক মুসলিম আছে, যারা অন্য মুসলিমদের ব্যাপারে ভীষণ সমালোচনাকারী। আপনারা দেখবেন যে, তারা কুফফারদের সাথে একই কাতারে দাড়াতে ইচ্ছুক এবং মুসলিমদের উপর **গুপ্তচরগিরি** ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী।

৪) 'তারা কুফফারদের প্রতি কর্কশ রূঢ়

তারা কুফফারদের প্রতি কর্কশ রূঢ়। তারাই কুফফারদের অত্যাচারের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ইচ্ছুক। তারাই সেই দল যারা কুফফারদের সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করতে চায়, যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেনঃ "তোমরা কাফিরদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যদ্দারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে ...।"

অপর দিকে, এমন মুসলিম দেখা যায় যারা অন্য মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত সমালোচনাকারী কিন্তু **কুফফারদের প্রতি ভীষণ নম্র।** তারা এ ব্যাপারে '***দাওয়াহ'র*** যুক্তি দেখায়। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। তারা ওদেরকে ঠিক করে বলছে না ইসলাম আসলে কি। তারা ইসলাম সম্বন্ধে ওদেরকে ভুল ধারণা দিচ্ছে।

৫) 'তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে

বর্তমান সময়ে কারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে- এটা বের করা কঠিন কিছু নয় ।

৬) 'তারা অপবাদকারীদের মিথ্যারোপে ভীত নয়

মুনাফিকরা তাদের দোষারোপ করবে। আর স্বাভাবিকভাবেই কুফফাররা তাদের বিরূদ্ধে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদিতে অপপ্রচার চালাবে। সবচেয়ে বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম, সংবাদপত্র তাদের ব্যাপারে কি বলল এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদের কাজে সন্তুষ্ট, আর কোন কিছুতেই তাদের কিছু যায় আসে না।

সা'দ বিন মু'য়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহিলিয়্যার যুগে বানু কুরায়দার মিত্র ছিল। উনি যখন মুসলিম হলেন, সাথে সাথে এই সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, কেননা ইসলামের দাবী অনুসারে এখন তার আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের প্রতি। পরে যখন বানু কুরায়দা আত্মসমর্পন করে তারা সা'দ বিন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত হয়, যেহেতু জাহিলিয়্যার যুগে সে তাদের মিত্র ছিল। আল আওস গোত্র সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে তার বিচারে দয়া প্রদর্শন করতে বলল। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললঃ **"সা'দের জন্য**

এটাই সময় আল্লাহর জন্য নিন্দুকেরনিন্দা ভয় না করার'' একথা শোনার সাথে সাথে তারা বুঝে গেল যে, তাদের পূর্বের মিত্রতা শেষ!

সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করল যে, 'তার বিচার মেনে নিতে তারা একমত কিনা', তারা বলল, 'হ্যাঁ'। একইভাবে, 'সে মুসলিমদেরকে-ও একই প্রশ্ন করল যে, তার সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিবে কিনা'। তারাও 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিল। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললঃ ''আমার সিদ্ধান্ত এটাই যে- সমস্ত পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং তাদের মহিলা ও শিশুরা মুসলিমদের অধিকৃত হবে।'' রসূল ﷺ বললেনঃ ''তোমার রায় আর সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহর রায় একই।''

সে দিন ৯০০ জন ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন এমন করা হয়েছিল? কারণ তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

এখন আসুন, **আত-তায়ীফা আল-মানসূরা** 'র বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতি আমরা লক্ষ্য করি, যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ-

- **তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।**

- **তারা জামা'আহ বদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করে**

- **যে কেউ তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে অথবা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে- যেই বলুক, সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক কিছুই তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা।**

বাস্তবে তারা সংখ্যায় বৃদ্ধিই পাচ্ছে। রামসফেল্ড তার গোপন ডায়রীতে বলেছিল যে, আমেরিকা বহু মুজাহিদ ধরেছে, হত্যা করেছে, কিন্তু তারপরও ওদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর কারণ তোমরা আত-তায়ীফা আল-মানসূরার সাথে যুদ্ধ করছ, যাদেরকে আল্লাহ্ স্বয়ং রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা যতই থামাক বা গ্রেফতার করুক না কেন, জিহাদ চলবেই ইনশাল্লাহ্।

লেখক শাইখ ইউসুফ কেন এই আয়াত (সূরা আল-মায়িদাঃ ৫৪) উল্লেখ করলেন সে দিকে ফিরে যাই। উনি

উল্লেখ করেছেন যে আয়াতে আছে **"يُجَاهِدُونَ"** যার অর্থ **"তারা জিহাদ করছে"**- এটা **বর্তমান কালের ক্রিয়া।** (অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এখানে বর্তমান কাল প্রয়োগ করেছেন) অন্যভাবে বলতে গেলে, যে কোন সময়ে আপনি এই আয়াত তিলাওয়াত করবেন, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ **জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্**করতে থাকবে। এটি একটি নিদর্শন বা ইঙ্গিত যে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে।

আল্লাহ্ যিনি অসীম দয়ালূ তিনি বলেনঃ **"ফিতনা দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথেযুদ্ধ কর, অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীতশত্রুতা নেই।"**

এই আয়াতে ফিতনা অর্থ কুফর। অর্থাৎ এই আয়াত বলছে যে, যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কুফর (অবিশ্বাস) দূরীভূত হয়। আর রসূল ﷺ এর হাদীস সমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামত পর্যন্ত কুফর (অবিশ্বাস) থাকবে। আর যেহেতু আমাদেরকে পৃথিবী থেকে কুফর দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে, অতএব জিহাদও চলবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জিহাদ শেষ হবে যখন ঈসা আলাইহিস সালাম এই পৃথিবী শাসন করবেন। এর কারণ কি? কেননা, ঈসা আলাইহিস সালাম কুফরের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং এরপর আর কোন কুফর থাকবেনা। ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পর আর কোন জিহাদ হবে না, কারণ আল্লাহ্ ঈমানদারদের জান নিয়ে নিবেন এবং দুনিয়াতে কেবল কুফফাররাই অবশিষ্ট থাকবে শেষ সময় অতিবাহিত করার জন্য। আরও উল্লেখ্য যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের বিরূদ্ধে কোন জিহাদ হবে না, কারণ ওদের বিরূদ্ধে জিহাদের সামর্থ্যই নেই। তারা অলৌকিকভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

জিহাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল নয়

"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন "।
(আলে ইমরান ১৪৪)

জিহাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল নয়

কোন নেতা বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে জিহাদ চলতেই থাকবে। কেউ কেউ বলে যে, আল্লাহর দ্বীন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল নয়, আর যদি আল্লাহর দাসরা আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করে, তবে আল্লাহ্ তাদের স্থলে অন্য ঈমানদারদের নিয়ে আসবেন যারা আল্লাহর কাজে অগ্রসর হবে। এটা সত্য। কিন্তু দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ যারা তা বলে, কেবলমাত্র কথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। অন্যভাবে বললে, **তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে** *জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ নির্দিষ্ট কিছু ব্যাক্তিবর্গ বা দলের উপর নির্ভরশীল !* আমরা এটা প্রমাণ করব যে, জিহাদ কোন নির্দিষ্ট নেতৃত্ব বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল নয়।

প্রথম প্রমাণঃ

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে জিহাদ কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, তাহলে এটা আমাদের আক্বীদাকে দূর্বল করে দেয়, কেননা এটি ভুল আক্বীদা। এবং এটি "জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে"- এই নীতিকে বদলে দেয়। কেননা, আমরা জিহাদের সাথে কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট করে ফেলছি এবং আমাদের কথাবার্তায় পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায় যে, '*যদি অমুক-অমুক মারা যায়, তাহলে জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে'।* উল্লেখ্য যে, ইবন ক্বাদামাহ رحمه

ﷲ বলেছেন যে, "ইমামের অনুপস্থিতি যেন জিহাদ বিলম্বিত বা স্থগিত করার কারণ না হয়।"

দ্বিতীয় প্রমাণঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সাহাবাদের এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যার ফলে সাহাবাগণ তাঁর উপরই নির্ভর করতেন এবং সম্পূর্ণভাবে ইসলামকে আকড়ে ধরে ছিলেন।

রসূল ﷺ তাদের দেখিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা ঠিক না, কারণ যখন সেই ব্যক্তি মারা যায়, তখন জিহাদও বন্ধ হয়ে যায়। একই সাথে, আল্লাহ্ রসূল ﷺ-এর উপরও নির্ভর না করার জন্য আয়াত নাযিল করেন।

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)

"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।" (আলে ইমরান ১৪৪)

এই আয়াতটি সাহাবাদের এটা শিক্ষা দিতেই নাযিল হয়েছিল যে, কোন ইবাদতই নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। ইসলাম কেবল আল্লাহরই অধিকারভূক্ত আর কারও নয়। অতএব, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, মুহাম্মদ ﷺ বা অন্য কারও উপর নয়।

এখানে আমরা শিরক বা আল্লাহর সাথে কোন ব্যক্তিকে শরীক করা নিয়ে আলোচনা করছি না বরং বলতে চাচ্ছি যে, কিছু মানুষ মনে করে যে, আল্লাহ অমুককে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা অমুককে জিহাদের অংশ করেছেন বলেই জিহাদ সফল হয়েছে। এটা একটি ভুল ধারণা।

এবার এই আয়াতের তাফসীর নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইমাম ইবন কাসীর رحمه الله বলেছেন যে, এই

আয়াতটি নাযিল হয়েছিল উহুদ যুদ্ধের সময় যখন এক কুরাইশ রসূল ﷺ-কে পাথর দিয়ে আঘাত করেছিল এবং ভেবেছিল সে তাঁকে হত্যা করেছে। সে তার লোকদের নিকট গিয়ে এটা প্রচার করে দিল। এই গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তা মুসলিমদের কানেও এলো যে, মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। এ কারণে কিছু মুসলিম হতাশ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আয়াতটি তখন নাযিল করলেন যে, *"মুহাম্মদ ﷺ একজন রসূল ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবং এর আগে আরও রসূল এসেছিল। এখন যদি সে মৃত্যু বরণ করে, তবে কি তোমরা পশ্চদপসরণ করবে এবং দ্বীন ত্যাগ করবে?"*

তোমরা কি তাঁর উপর নির্ভরশীল, না আল্লাহর উপর?
এই আয়াত দ্বারা কিছু সাহাবাদের সমালোচনা করা হয়েছে। এই খবর দ্বারা কিছু মুসলিম প্রভাবিত হয়েছিল। আবার কিছু মুসলিমের উপর এর কোন প্রভাবও পড়েনি।

আনসারদের মধ্য থেকে একজন মুসলিম বলেছিলঃ ***"যদি তিনি মারা গিয়েও থাকেন,তিনি তো তাঁর বার্তা পৌছিয়েই গিয়েছেন। অতএব, তার জন্য যুদ্ধ কর এবং তাঁর মত মৃত্যু বরণ করে নাও।"*** এই সাহাবী এ গুজবের কারণে ভেঙ্গে পড়ার বদলে **বরং আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় চিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন।** কেননা যেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, তারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছিল।

যখন রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল ﷺ -এর বাড়িতে আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ঘরে গেলেন এবং তিনি রসূল ﷺ-এর কপালে চুম্বন করলেন আর বললেন , "জীবিত অবস্থায় আপনি ছিলেন পবিত্র এবং মৃত অবস্থায়ও, আল্লাহ্ আপনাকে দু'বার মৃত্যুর স্বাদ আস্বদন করাবেন না।" এরপর তিনি মসজিদ গেলেন যেখানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষদের সাথে কথা বলছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা শুনতেই চাচ্ছিলেন না যে, রসূল ﷺ মারা গেছেন। সে মানুষকে বলে বেড়াতে লাগল, "যে-ই বলবে যে রসূল ﷺ মারা গেছেন আমি তার শিরচ্ছেদ করব। মূসা আলাইহি সালাম যেমন আল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি মুহাম্মদ ﷺ-ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন। অতএব, তিনি ফিরে আসবেন।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে থামিয়ে বললেনঃ ***"হে মানুষ! যে মুহাম্মদের ﷺ ইবাদত করত, সে জানুক যে মুহাম্মদ ﷺ মারা গিয়েছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করত,সে জানুক যে***

আল্লাহ্ জীবিত এবং তিনি চিরঞ্জীব"

এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, **সবাই এইআয়াতটি জানতেন** কিন্তু যখন তারা এটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মুখে আবার শুন লেন, তখন এমন লাগল যেন, এটি তারা এই প্রথম শুনেছেন ! কেননা, তারা এমন এক মানসিক অবস্থায় ছিল, যাতে করে তারা সবই ভুলে গিয়েছিল। এরপর সবাই পুনঃ পুনঃ এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করতে থাকল। সবাইকেই তার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু বরণ করতে হবে। **এটিই ছিল শিক্ষা।**

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا)

"আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না -সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।".
(আলে ইমরান ১৪৫)

আল্লাহ্ মহামহিম আরও বলেনঃ...وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ **"... কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না কিন্তু লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"** (সূরা ফাতির ১১)

- ✓ লেখক শাইখ ইউসুফ আল উরাইয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কেবল এই দুইটি আয়াতই কাপুরুষদের সাহসী বানাতে এবং আল্লাহর জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিতে যথেষ্ট। কারণ সাহসিকতা কারও আয়ুষ্কাল কমায় না আর কাপুরুষতা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে না। আর আপনার যত ভয়ই থাকুক না কেন, তা আপনার আয়ু একটুও বাড়াবে না। যদি কোন মু'মিন এই পর্যায়ের ইয়াক্বীনের অধিকারী হয়, যখন সে অনুধাবন করতে পারে যে, মৃত্যু এটা নির্দিষ্ট সময়েই হবে এবং কোন কিছুই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না, তখন সে হয়ে উঠে ভীষণ সাহসী, কোন কিছুই তাকে ভীত করতে পারে না। সে আল্লাহর সমস্ত শত্রুকে কেবল সেই সব সৃষ্টি হিসেবে দেখবে, যাদেরকে আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাহলে ওদেরকে কিসের ভয়?

- ✓ খালিদ বিন ওয়ালিদ এতই সাহসী ছিলেন যে, তিনি নিজেকে শত্রুবাহিনীর মাঝে ছুড়ে দিতেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেনঃ ***"আমি নিজেকে শত্রুবাহিনীর মাঝে এমনভাবে ছুঁড়ে দিতাম যে নিশ্চিতভাবে আমি জানতামযে এখান থেকে বেঁচে ফেরা সম্ভব না আর দেখ এই বিছানাতেই আমার মৃত্যু হচ্ছে ! অতএব কাপুরুষদের চোখ যেন কোনদিন ঘুম না দেখে"***

> তিনি কাপুরুষদের বিরুদ্ধে দো'আ করলেন এটা বোঝানোর জন্য যে, কি করে মানুষ কাপুরুষ হতে পারে, যেখানে সাহসিকতা তাকে মারতে পারে নি !

লেখক এখানে ইরাকে পার্শিয়ান রাজত্বের ফুতুহাত (বিস্তার) এর সময়কার হাজ্জাজ বিন 'উদে নামের এক মুসলিমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও পার্শিয়ান সেনাবাহিনীর মাঝে একটি নদী ছিল। তো হাজ্জাজ মুসলিমদের বললঃ "নদী পার হয়ে তোমরা শত্রুর সাথে মিলিত হচ্ছো না কেন?" সে তার ঘোড়ার উপর বসে ছিল এবং ঘোড়া নিয়ে সে নদী পার হওয়া শুরু করলে অন্য মুসলিমরাও তাকে অনুসরণ করতে থাকল। পার্শিয়ান সেনাবাহিনী মুসলিমদের এভাবে ঘোড়া নিয়ে নদী পার হওয়ার দৃশ্য দেখে ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেল। তারা চিৎকার করে উঠলঃ **"দাইওয়ান ! দাইওয়ান !"** যার অর্থ- "জিন! জিন!" তারা সবাই পালিয়ে গেল। **এখানেই যুদ্ধের ইতি ঘটল।**

হাজ্জাজ এই ঘটনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেনঃ "আল্লাহর হুকুম ব্যতিরেকে কেউই মৃত্যু মুখে পতিত হয় না। যদি আল্লাহ চান কেবল তাহলেই আমাদের মৃত্যু হবে। মৃত্যু থেকে আমরা কেউই সুরক্ষিত নই। যদি আমাদের মৃত্যু না হওয়ার থাকে, তাহলে আল্লাহই আমাদের রক্ষা করবেন।"

যাদ বিন মাসীর গ্রন্থের লেখক তার তাফসীরে বলেছেন যে, ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ "শয়তান উহুদের ময়দানে চিৎকার করে ঘোষণা দিয়েছিল যে মুহাম্মদ ﷺ মারা গিয়েছেন।" তখন কিছু মুসলিম বলল যে, "যদি মুহাম্মদ ﷺ মারা গিয়ে থাকেন, তো চল আমরা আত্মসমর্পন করি। এরা তো আমাদেরই গোত্র, স্বজন। যদি মুহাম্মদ ﷺ বেঁচে থাকতেন, তবে আমরা পরাজিত হতাম না।" তারা আসলে যুদ্ধ না করার পক্ষক্ষ যুক্তি বের করেছিল। আব্দুল হাক বলেনঃ কিছু মুনাফিকুন বলল যে, "মুহাম্মদ ﷺ তো মারা গেছেন, চল আমরা আমাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যাই।"

• আল্লাহ মানুষদের পরীক্ষা করেন এবং এই পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন হয়

পরীক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় এর উপরই ফলাফল নির্ভরশীল। আমাদের জীবন এরকম বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে পরিপূর্ণ। আমরা যদি এমন পরীক্ষায় পাশ করে যেতে পারি, তবে আমরা ক্রমান্বয়ে বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতর হতে পারি।

আশ-শাউকানি رحمه الله উল্লেখ করেন কিভাবে শয়তান উহুদের দিনে চিৎকার করেছিল এবং কিছু মুসলিম বলে

উঠলঃ **“মুহাম্মদ ﷺ যদি রসূল হয়ে থাকেন,তবে তিনি মরবেন না!”** অতঃপর আল্লাহ্ এই আয়াতটি নাযিল করেন। আল্লাহর আদেশেই তাঁর রসূলগণের কেউ কেউ নিহত হতে পারে।
কিছু মুসলিম বললঃ “চলো, আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাইয়ের কাছে চলো। তাকে কুরাইশদের কাছে আমাদের আত্মসমর্পনের মধ্যস্থতা করে দিতে বলি।” ওরা তার কাছে গেল কেননা ওরা জানত যে কুফফারদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল।

আনসারদের একজন আনাস বিন নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেনঃ **“যদিও বা মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়ে থাকেন, আল্লাহ্ তো নিহত হননি। অতএব, চল আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমরা লড়াই করি”** সে কিছু মুসলিমকে যুদ্ধ ময়দানে বসে থাকতে দেখে তাদের জিজ্ঞাসা করল, “কি ব্যাপার তারা কি করছে।” তারা জবাব দিলঃ “মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়েছেন। (এখন) আমরা কি করব?” তিনি তাদের বললঃ **“যদি মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়ে থাকেন, তবে তোমরা উঠে দাড়াও যুদ্ধ কর এবং তাঁর মত তোমরাও নিহত হও”** তার কথা শুনে কিছু মুসলিম তাই করলেন এবং শহীদ হলেন।

সঠিক এবং ভ্রান্ত ধারণাঃ
যারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছিল তাদের ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

ক. যারা রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সংবাদের কারণে অকৃতকার্য হয়েছিল। তারা দূর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এই ধাক্কা সামাল দিয়ে উঠতে পারে নি। তারা শান্তি চেয়েছিল এবং মৃত্যু এড়াতে চেয়েছিল।

খ. এরচেয়েও খারাপ অবস্থানে ছিল তারা, যারা কুফরের দিকে ফিরে গিয়েছিল।

জিহাদ রসূল ﷺ-এর উপর নির্ভরশীল নয়।
যে দু’শ্রেণীর লোকেরা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল, তাদের মতই আজকের অনেক মুসলিমদের অবস্থা। আমরা অনেক মুসলিমকেই বলতে শুনি যে, যদি তালেবানরা সঠিক পথের উপর থাকত, তবে তারা পরাজিত হত না। কিছু লোক বলেছিল, ইসলাম ভুল ধর্ম, কেননা মুহাম্মদ ﷺ যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ করেছে। ঠিক একই ঘটনা আমরা এখনও দেখি, যখন মুসলিমরা বলে যে, *তালেবানরা ভুল ছিল, কেননা তারা যুদ্ধে হেরে গিয়েছে।* এটা বলাটাই ভুল। কেউ কেউ বলে যে আরব মুজাহিদীনদের যার যার দেশে ফিরে গিয়ে সরকারের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা

করা এবং তাদের সাথে হাত মিলানো উচিত। এটা মুসলিমদের **আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইর**(মুনাফিকদের নেতা) নিকট গিয়ে কুরাইশদের নিকট তাদের আত্মসমর্পন করার ব্যবস্থা করতে বলারই মত।
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই দেখা যায় যে, আজকের দিনেও যারা পথভ্রষ্ট তারা আসলে তাদের পূর্বেরই কারও মত একই ভুল পথ অনুসরণ করেছে।

যারা সঠিক পথ অবলম্বনকরে তারা আনাস বিন নাদররাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মত,

যে মানুষদের বলেছিল, *"তোমরা বসে আছ কেন?"* তারা বসেছিল কারণ মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন *"তাহলে তোমরা কিসের জন্য বেঁচে থাকবে? উঠে দাঁড়াও এবং তাঁর মত যুদ্ধ কর।"* তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতও যিনি বলেছিলেন , "যে মুহাম্মদ ﷺ ইবাদত করে সে জানুক ... তিনি চিরঞ্জীব।" তারা নেতার মৃত্যুতে বিচলিত না হয়ে লড়ে যায় তারা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -এরও মত যিনি বলেছিলেন, *"যদি মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়ে থাকেন, তবে আমি তার দ্বীনের জন্য লড়াই করব।"* এই মানুষরাই সঠিক ধারণার অনুরসরণ করে, জিহাদ কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, যদিও বা সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ -ও হয়।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"

এই আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল সাহাবাদের এটা বোঝাতে যে- পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তা যেন কখনই তাদেরকে দূর্বল না করে দেয়, কেননা তারা সবসময়ই মর্যাদায় উচ্চ এবং শেষ সফলতা মুত্তাকীদের জন্যই।

পরম দয়ালু আল্লাহ বলেনঃ **"যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসেপৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরাবলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমারইপক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।"**

অতএব, ঈমানদারদের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করা উচিত যখন তারা পরাজিত হয়, যাতে আল্লাহর উপর

তাদের ঈমান ও ইয়াক্বীন বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহর সত্যিকার আউলিয়ায় পরিণত হতে পারে। তাদের আরও তিলাওয়াত করা উচিতঃ **"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে।"**

জয়, পরাজয় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর তরফ থেকে আসেঃ

বিজয় আল্লাহর অধিকারভূক্ত, আমাদের নয়। আমরা এটা অর্জন করিনি বা একে এতদূরে নিয়েও আসিনি। এটা পুরোটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য উপহার, যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ **"সুতরাং তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষক্ষপ করনি যখন তা নিক্ষক্ষপ করা হয়েছিল, বরং তা নিক্ষক্ষপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি যথাযথ ইহসান করতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবনকারী ও পরিজ্ঞাত।"**

এবং **"বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।"**

কুরআনে কখনই বিজয় মু'মিনদের উপর আরোপ করা হয়নি। এটা সবসময় আল্লাহর করুণা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর যদি ঈমানদাররা বিজয়ী হয়, তবে তারা বলবেঃ **"স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে। তোমরা আশংকা করতে যে লোকেরা তোমাদেরকে আকস্মিক ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে উত্তম বসতু সমূহ জীবিকাস্বরূপ দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"**

আল্লাহর সাহায্য ও ভালবাসার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। অতএব, আমরা বিজয়ী বা বিজিত হই এটা আমাদেরই ভালোর জন্য, কেননা এতে আমাদের ঈমান ও ইয়াক্বীন বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ এতেই সন্তুষ্ট হন যে, আমাদের কাজকর্ম সবই আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী হবে।

ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করবেন নাঃ

আমাদের এ জন্য কিছু করা উচিত না যে, এতে করে আমাদের বিজয় হবে বা ফলাফল আমাদের পক্ষে আসবে, বরং কেবল এজন্যই করা উচিত যে, **আল্লাহ্ আমাদের করতে বলেছেন** আর ফল সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। আমরা আল্লাহর সৈন্য। আমাদের পরিণতির চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছেন তা করে যাওয়া উচিত। আর সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। আমরা তো গায়েবের জ্ঞান রাখি না। একই সাথে, আমাদের কাজটা কি ভুল ছিল না ঠিক ছিল, তা আমরা পরিণাম দেখে বিচার করি না। বরং আমরা কাজের বিচার করি এর ভিত্তিতে যে, তা আল্লাহর হুকুম মত হয়েছিল কিনা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন অমুসলিমকে কোন মুসলিম ইসলাম কবুল করায়, তবে তার সম্পর্কে এমন বলা যাবে না যে, *"সে কত ভাল দা'য়ী যে একজনকে ইসলামে নিয়ে এসেছে"* !

সে কতজনকে ইসলামের ছায়াতলে এনেছে সেই সংখ্যার ভিত্তিতে আমরা তাকে বিচার করব না। বরং সে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পন্থায় দাওয়াত দিচ্ছে কি না- এর ভিত্তিতেই তার বিচার হবে। যদি তার দাওয়া, রসূল ﷺ এর দাওয়ার পদ্ধতির অনুরূপ হয়, তবে **সেই দাওয়াহ কেউ কবুল না করলেও সে সফলকাম।** যদি তার পদ্ধতি রসূল ﷺ-এর অনুরূপ না হয়, তাহলে সে ভুল করছে, যদিওবা দলে দলে লোক দাওয়াহ কবুল করতে থাকে। নূহ আলাইহি সালাম এর কথা ভাবুন, তিনি কি সফল না ব্যর্থ? এ সমস্ত মানদন্ড অনুযায়ী তিনি ব্যর্থ, (কারণ সংখ্যার বিচারে ৯০০ বছরে মাত্র আশি জন লোক ঈমান এনেছিলেন) আর এটা বলাটা অনৈসলামিক ছাড়া আর কিছু না।

আমরা জানি যে বিচার দিবসে কিছু আম্বিয়া আসবেন যাদের অত্যন্ত অল্প সংখ্যক অনুসারী থাকবে এবং কিছু আম্বিয়া আসবেন যাদের **কোন অনুসারীই থাকবে না** তাহলেই কি আমরা বলতে পারি যে তাঁরা ব্যর্থ? তাঁরা আল্লাহর নবী ছিলেন এবং দাওয়াহ দেয়াই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য। তাঁরা আল্লাহ্ যা বলেছেন তা-ই করেছেন। **তাঁরাই ছিলেন সঠিক।** অতএব, আমরা পরিণামের ভিত্তিতে বিচার করব না এবং রসূল ﷺ এর পদ্ধতিরও পরিবর্তন করার চেষ্টা করব না এবং *"আমরা আধুনিক যুগে বসবাস করছি"* এ কারণে রসূল ﷺ এর কোন পদ্ধতির পরিবর্তন করার চেষ্টা করব না।

অগ্রিম ধারণা ভিত্তিক ফলাফলের উপর বিচারঃ

আজকের উম্মাহর জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় ত্রুটি। আমরা সবকিছুই **ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার** করি, এমনকি ইসলামী আন্দোলনগুলোও এভাবেই কাজ করে। এটা পশ্চিমা প্রভাবের কারণেও হতে পারে। আমরা ইসলামকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মত মনে করি না। ব্যবসার ক্ষক্ষত্রে ফলাফলের ভিত্তিতেই সাফল্যর বিচার হয়। যদি দিন শেষে যথেষ্ট টাকা-পয়সা না হয় , তাহলে ধরে নেয়া হয় কিছু একটা সমস্যা আছে। আবার ভাল করে খতিয়ে দেখা হয়। কিমত্মু আমরা আমাদের ইবাদতকে এভাবে নিতে পারিনা। আমরা যা কিছু করি, তা কেবল আল্লাহ্ বলেছেন বলেই করি, তা সেটার ফল ভাল হোক বা মন্দ, এটা পুরোপুরি আল্লাহর উপর। আমরা কোনকিছুর ফল-ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা।

আর যদি কেউ পরিণামের ভিত্তিতে বিচার করে, তবে তার বলার কথা যে উহুদ ছিল একটা ভয়াবহ ব্যর্থতা এবং রসূল ﷺ এর এখানে যুদ্ধ করাই ঠিক হয়নি, এটা তার ভুল ছিল (নাউযুবিল্লাহ!)। কিন্তু এমন কথা কেউ ভয়ে বলে না। আমরা বলি রসূল ﷺ ঠিক কাজই করেছেন, কেননা তিনি কেবল আদেশ পালন করেছিলেন (জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্)।

মুনাফিকরা নিম্নোক্তভাবে জিহাদ সম্পর্কে ধারণাপোষণ করেঃ ‘‘যদি জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা, পদমর্যাদা, সম্পদ ও গণীমতের মাল পাওয়া যায়, তবে আমরা মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দিব। আর যদি জিহাদের কারণে আমাদের **ক্ষমতা, পদমর্যাদা, সম্পদ, জীবন** হারাতে হয় তবে, আমরা জিহাদে যোগ দিবনা। এটা হিকমত পরিপন্থী”।

আরেকভাবে প্রমাণ করা যায় যে জিহাদ-ই সঠিক পথ এবং **ফলাফল** নিয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। সেটা হচ্ছে রসূল ﷺ মৃত্যুর পূর্বে, রোমান সম্রাজ্যের বিরূদ্ধে ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান। তিনি যখন মারা গেলেন, সেই বাহিনী তখনও রোমান সাম্রাজ্যে যায় নি, সৈন্যদের একত্রিত হবার স্থান ছিল। ঐটাই ছিল সৈন্য ঘাটি। রসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যুর পর মদীনার আশপাশের সমস্ত আরব গোত্ররা মুরতাদ্দীন হয়ে গেল। তাই সাহাবাগণ বলল যে, এই ৩০০০ সৈন্য এখন এখানেই থাকুক, কারণ এখানেই এদের বেশি দরকার। তারা বললঃ *‘‘আমাদের জন্য এখন রোমানদের সাথে যুদ্ধ করাটা যথাযথ হবে না, যেখানে মদীনার অদূরেই আমাদের বিপদ অপেক্ষা করছে।’’* এমনকি এই বাহিনীর সেনাপতি উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু -এরও

একই মত। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে মৌখিক বার্তা পাঠালেন যে, অধিকাংশ মুসলিমই তাঁর সাথে এবং তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, রসূল ﷺ এর খলিফা ও তাঁর স্ত্রীদের অরক্ষিত অবস্থায় মদীনায় রেখে যাওয়াটা উচিত হবে না। তাছাড়া, তারা মদীনাকে সৈন্যহীন অবস্থায় রেখে যেতে চাননি।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেনঃ ***"যদি রসূল ﷺ -এর স্ত্রীদের পা কামড়ে ধরে কুকুর টেনেও নিয়ে যায় তারপরও আমি এই বাহিনী পাঠাবো আর যদি মদীনায় আমি ছাড়া আর কেউ নাও থাকে তারপরও আমি এই বাহিনী পাঠাব কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ দিয়েছেন।"***

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে উনি **ফলাফল** নিয়ে একটুও উদ্বিগ্ন ছিলেন না। যদি সবাই মারা যায় আর উনি একাই জীবিত থাকেন, তারপরও তিনি সেই সেনাবাহিনী পাঠাবেন। যদি পরিস্থিতি এতই খারাপ হয় যে **কুকুর রসূল ﷺ -এর স্ত্রীগণদের পা টেনে নিয়ে যেতে থাকে, তারপরও তিনি এই বাহিনী প্রেরণ করবেন।**

তিনি বলতে চান যে, যদিও বা পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়, তারপরও তিনি রাসূলের ﷺ কথানুযায়ী কাজ করবেন। এটা সেইসব লোকদের কথার পরিপন্থী **যারা প্রতিটি কাজের লাভ লোকসান হিসাব** করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীয়াহর সমস্ত বিষয় **ভেজিটেবল স্যুপে** পরিণত হয়, অর্থাৎ সবকিছু নষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়। তখন শরীয়াহর কোন কিছুই আর বাকি থাকবে না, কারণ তারা সবকিছুকেই **লাভ-লোকসান** দিয়ে হিসাব করে আয়ত্তে আনতে চায়।

সুবহানাল্লাহ! জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ তো সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিই বয়ে আনে, তোমরা কি তোমাদের জীবন ও সম্পদ বিপদে ফেলতে যাচ্ছ! এটা তো নাফ সাদা, মাসলাহা নয়, যেহেতু তুমি তোমার জীবন ও সম্পদ বিপদে ফেলছ।

তাছাড়া, আমরা জিহাদের ব্যাপারে কোন ইজতিহাদ করতে পারি না। আপনারা কি সালাতের ব্যাপারে ইজতিহাদ করেন, যে সলাত পড়বেন কি না? সালাতের আদেশ নির্দিষ্ট ও স্থায়ী। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর ব্যাপারটি ছিল ইজতিহাদের বিষয়। যদি তা না হত, তাহলে সাহাবাগণ এর বিরুদ্ধে কথা বলতেন না।

অনেকেই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র বিরূদ্ধে অনেক যুক্তি খাড়া করে যে, এর পরিণাম ভাল হবে না। আমাদের জবাব হওয়া উচিত **"ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই। জিহাদ হচ্ছে ফারদুল'আইন, অতএব এটা আমাদের করতেই হবে, যদিওবা কুকুর আমাদের পরিবারবর্গকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।"**

রোমান সাম্রাজ্যের দিকে যাবার পথে মুসলিম বাহিনী এমন এক আরব এলাকা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, যারা মুসলিমদের আক্রমণ করার ফন্দী করছিল। তারা তখন দেখল যে মুসলিম বাহিনী রোমানদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে, তারা নিজেদের বললঃ *"যদি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি এদের থাকে, তবে নিশ্চয়ই মদীনায় প্রতিরক্ষার জন্য এর চেয়েও বেশি শক্তি সেখানে রয়েছে"*, অতঃপর তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল এবং মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ কুফফারদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন, এমনকি যখন মুসলিমরা ছিল দূর্বল। যদি মুসলিমরা খাঁটি ও আন্তরিক হয়, তবে আল্লাহর সাহায্য আসবেই। যখন রোমানরা মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেল, তাদের কি অবস্থা হল? হিরাকল একই দিনে রসূল ﷺ-এর মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েছিল। সে বললঃ *"যদি এদের নেতার মৃত্যুর দিনেই তাঁর বাহিনী যুদ্ধ করতে পাঠান হয়, তবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন ব্যাপার আছে"*।

অতঃপর তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাল। এমনই হয় যখন কেউ পরিণামের ভার পুরোপুরিভাবে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করল অর্থাৎ একজন রোমানও তাদের সম্মুখীন হল না। তারা গণীমতের মাল সংগ্রহ করে মদীনায় ফিরে গেল। এই আয়াতের অর্থ এটাই- **"... যে কেউ আল্লাহ কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন ..... যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুরজন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা"**

যতক্ষণ আপনার তাক্ওয়া আছে, আল্লাহও আপনার সাথে ততক্ষণই আছেন।
তাক্ওয়া যতই বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ্ও তত বেশি আপনাকে সাহায্য করবেন।

ফলাফলের ভিত্তি বিচার করলে তা কুফর আর হতাশাই বয়ে আনেঃ

যারা ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করে, পরিণাম স্বরূপ তা হয় **কুফরের দিকে নিয়ে যায়**অথবা **হতাশা** বয়ে আনে। এটা ভীষণ বিপজ্জনক। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলিমই আজ তাই করছে। অনেক মুসলিমই বিজয় ও পরাজয়ের ব্যাপারে ভীষণ কপটতাপূর্ণ অভিমত পেশ করে। যদি তারা কোথাও মুসলিমদের বিজয় দেখে, তবে তারা এর প্রশংসা করবে এবং মানুষকে দেখাবে যে তারাও এর-ই অংশ ছিল। আর যদি মুসলিমদের পরাজয় দেখে, তবে এর সমালোচনা করবে এবং মানুষকে দেখাবে যে, তাদের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। ইতিহাসেই এর উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমন করল, তখন অনেক মুসলিমকেই এর জন্য প্রস্তুতি নিতে, এর পক্ষে খুতবাহ দিতে, এসবের প্রশংসা করতে দেখা গেল। আবার যখন আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করল, তখন ঠিক এদেরকেই আমরা পুরো উল্টা অবস্থান নিতে দেখি। তারা মুজাহিদীনদের সমালোচনা করে, তাদের অপমানিত করে, তাদের **জঙ্গী-সন্ত্রাসী** হিসাবে আখ্যায়িত করে আর বলে যে, *ওদের কোন হিকমাহ নেই।*

অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আক্রমণ এবং আমেরিকা কর্তৃক আক্রমণ
এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, *মুসলিমরা আমেরিকাকে ভয় করে।* কারণ তারা দাবী করে যে তারা মানুষের ক্ষতি করতে সক্ষম। তারা আমেরিকাকে এর স্লোগান আর কাজকর্মের জন্য ভয় পায়। বুশ বলেছে যে, *'আপনি যেখানেই থাকুন না কেন ন্যায়-বিচারের দীর্ঘ হস্ত আপনাকে ধরবেই'।* অতএব, মানুষ আল্লাহর ক্রোধ আর অভিশাপকে ভয়ের বদলে আমেরিকার ক্রোধকে ভয় করে।

আজকালকার বেশিরভাগ উলামাই জিহাদের বিরুদ্ধে কেন?

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমেরিকা এর সাথে জড়িত। এটি নিফাকের একটি চিহ্ন।
আফগানিস্তান এর আগেও কুফফারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এবারও কুফফারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুজাহিদীনদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় লাভ হচ্ছে যে তাদের বাহিনী পরিশুদ্ধ হয়; কারা কুফফারদের পক্ষে জয়ধ্বনি দেয় তা প্রকাশ হয়ে যায়। মানুষ তখন জানতে পারে, **কারা মু'মিন আর কারা মুনাফিক।** আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

(وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا)

''আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, **আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি।**''

যেসব মানুষ জিহাদে যাওয়ার কথা ভেবেছিল আর পরে এর পরিণতি দেখে বলল, "*আলহামদুলিল্লাহ্! আমি যাইনি। তা নাহলে আমি এখন হয়ত কোন দ্বীপে (গুয়ানতানামো) আটকে থাকতাম।*" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا (الَّذِينَ
اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

''এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয় তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয় তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।''

মানুষ মুজাহিদীনদের নিয়ে লাফালাফি করে, কিন্তু যখন ওদের পরাজয় হয় তখন তারা বলে যে, '*ওদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই*'। জিহাদ এমন একটি ইবাদত যা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা এর উপযুক্ত। এটা তাদের জন্য, যারা দুঃখ ও কষ্টের পরীক্ষা সামাল দিতে পারে। কখনও কখনও জিহাদের সাথে বিজয় বা বীর প্রমাণিত হওয়া কিংবা গণীমতের মাল ইত্যাদির কোনও সম্পর্ক থাকে না। আজকের দিনে জিহাদ করা মানেই হয় নিহত হওয়া বা গ্রেফতার হওয়া। তথাপি এটা জিহাদে না যাবার কোন অজুহাত নয়। আমাদের সম্পদ ও সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল এদিকেই পরিচালিত করা উচিত।

যদি কেউ জিহাদ করে আর ভেবে নেয় যে, জিহাদ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, তবে **বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হবে** যদিওবা এটা যুদ্ধের ময়দানে **পার্থিব পরাজয় নাও বয়ে আনে**, তথাপি এটা তাদের

অন্তরে নৈতিক পরাজয় বয়ে আনবে যখন তারা দেখবে যে, তারা যে নেতার উপর জিহাদের বিজয় নির্ভরশীল ভেবেছিল, তার মৃত্যু হয়েছে। অতএব, কোন ব্যক্তি বা নেতার উপর নির্ভরশীল হওয়াটা অনুচিত। জিহাদকে কোন ব্যক্তির উপর নির্ভশীলতা থেকে মুক্ত করা উচিত।

হ্যাঁ, অবশ্যই সমস্ত পরিকল্পনা ও অন্যান্য কাজে সমন্বয়ের জন্য আমাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন,
তবে নেতৃত্ব হারানোর সাথে সাথে যেন মুসলিমদের সাথে জিহাদের সম্পর্ক শেষ না হয়ে যায়। কোন বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতি আহবান জানাচ্ছি না। পরিকল্পনাকারী, সমন্বয়কারী হিসেবে আমীর থাকবে কিন্তু জিহাদ চালু রাখার জন্য তার বেঁচে থাকা জরুরী নয়।

যখন সে মারা যাবে, **তখন অন্য আমীর** তাঁর জায়গায় আসবে।

আল্লাহ্ তার জায়গায় **এর চেয়েও উত্তম আমীর** দিতে পারেন। ইতিহাস সাক্ষী হয়ে আছে এমন সব সিংহের, যাদের সামর্থ্যের ব্যাপারে মানুষ ভাবতেও পারেনি।

এই উম্মাহ বৃষ্টি বর্ষনের মত! আপনি বুঝতে পারবেন না কখন এই উম্মাহর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ আসছে অথবা চলে যাচ্ছে , তখন এ সব ব্যাপারে সমঝদার মুসলিমরা এ পথে কেবল আরও দৃঢ়ই হবে, কেননা তারা জিহাদের রবের ইবাদত করে, জিহাদের নেতৃত্বের না।

নেতার মৃত্যুর সম্ভাবনা তো অন্য যেকোন সাধারণ সৈন্যের মৃত্যুর সম্ভাব্যতার মতই।
আমাদের নেতারা তো আসলে **শাহাদাহ'র সন্ধানেই রয়েছে** যাতে করে তারা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে পারে এবং আল্লাহর এত নিকটবর্তী হতে পারে, যা এর পূর্বে কখনও হয়নি। তারা অধীর আগ্রহে সেই দিনের অপেক্ষাই করছে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, **জিহাদ একটি ধ্রুবক,**
কেননা রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর জিহাদ তো কমেইনি, বরং বেড়েছে।
খুলাফা আর রাশিদীনের সময় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটল।
জিহাদ নিজেই এত শক্তিশালী একটি ইবাদত যে, নেতার অনুপস্থিতি একে নাড়া দিতে পারে না।

জিহাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদের নির্দিষ্ট কোন স্থানের উপর নির্ভর করে না

জিহাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদের নির্দিষ্ট কোন স্থানের উপর নির্ভর করে না

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে- এর পক্ষে সমস্ত প্রমাণ দেয়ার পর ,
এখন আমরা এ প্রমাণ দিব যে, জিহাদ কোন নির্দিষ্ট স্থানের উপর নির্ভরশীল নয়।

লোকে বলে, জিহাদ করতে চাইলে অমুক (নির্দিষ্ট) স্থানে যেতে হবে। এখন সমস্যা হচ্ছে, যদি ঐসব স্থানে জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়, তবে মানুষ কোথায় জিহাদ করবে? অতএব আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে; জিহাদ বিশ্বজনীন, এটা কেবল স্থানীয় ঘটনা নয়। জিহাদ কোন সীমানা বা অন্তরায় দ্বারা বাধা পড়ে না; এগুলো জিহাদের পথে বাধা হতে পারে না। জিহাদ এ সমস্ত ঔপনিবেশিক সীমান্ত স্বীকার করে না, যেগুলো মানচিত্রে কোন এক কালের শাসক একেছিল। জিহাদ এ সমস্ত সীমানা মানে না।

জিহাদ অবশ্যই আপনার জীবনের একটি অংশ হতে হবে

যদি কোন মুসলিম **আল্লাহর বার্তা ছড়াতে**চায়, তবে তার **জিহাদের অনুশীলন**করা উচিত। সাহাবাগণ এভাবেই ব্যাপারটা বুঝতেন। তাঁদের এই বুঝের একটি সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় ইরবা'ঈ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে একজন সাহাবার চিঠিতে যিনি পারস্য সেনাপতি রুস্তমের নিকট দূত হিসেবে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেনাপতি তাকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে এসেছে। ইরবা'ঈ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার **আক্রমণাত্মক জিহাদের মূল উদ্দেশ্য**সম্পর্কে সংক্ষেপ্ত যা বলেছিল তা হচ্ছেঃ

> ''আল্লাহর ইচ্ছায় **মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে উদ্ধার**করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োগ করার জন্য আল্লাহ্ আমাদের পাঠিয়েছেন। যারা দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে আখেরাতের সীমাহীন কল্যাণ পেতে ইচ্ছুক, তাদের সে প্রশস্ত ময়দানে পৌঁছাতে এবং **মানব রচিত ধর্মের অত্যাচার**থেকে রেহাই দিয়ে মানুষকে ইসলাম প্রদত্ত ন্যায় নীতির অধীনে আনয়ন করা আমাদের লক্ষ্য। তিনি আমাদের এই দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, মানুষকে এর দিকে আহবান করার জন্য। যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তবে আমরা তোমাদের এই স্থানের দায়িত্বে ছেড়ে দিব আর যে কেউ আমাদের দাওয়াহ বা আহবান প্রত্যাখ্যান করে তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতিতে পৌছতে পারি।'' (আল বিদায়া ওয়া আন নিহায়া- ইবনে কাসীর)

ইরবা’ঈ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আল্লাহর সাথে অন্য মূর্তি এবং তাগুতের পূজা করা ঠিক নয়। তিনি বলেন যে, *‘‘আমরা তোমাদের বাঁচাতে এসেছি, যদিও হিদায়াত মানুষের হাতে নয় বরং আল্লাহর হাতে’’*, তথাপি তিনি বলেছেন, *‘‘এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োগ করার জন্য আল্লাহ্ আমাদের পাঠিয়েছেন।’’* কুরআন-ই মানুষকে সত্য পথ দেখায় এবং মানুষের পরিণাম সম্পর্কে বলে দেয়। এটা এমন গ্রন্থ যা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। কুরআন সবকিছুর সঠিক রূপ সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং প্রকৃতপক্ষ দুনিয়া কি তা মানুষকে বুঝিয়ে দেয়। একজন সত্যিকারের মুসলিম অনুভব করে যে, সে নবীদের প্রকৃত অনুসারী। **রুস্তম** জিজ্ঞাসা করেছিল, **‘‘আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি?’’** তিনি বলেন, *‘‘নিহতদের জন্য জান্নাত আর যারা বেঁচে থাকবে তাদের জন্য বিজয়।’’*

আক্রমণাত্মক জিহাদের আগে দাওয়াহ দিতে হবে।

এক্ষেত্রে *এটাই জিহাদের উদ্দেশ্য।* কারণ এখানে খিলাফতের প্রসার হচ্ছে। তবে *জিহাদ আদ-দাফ* বা আত্মরক্ষামূলক জিহাদে দাওয়াহ দেয়ার কোন সুযোগ নেই, কারণ এখানে শত্রুদের সেই স্থান থেকে প্রতিহত করাই উদ্দেশ্য। মানুষ বলে, *‘‘কেন দখলকারীদের সাথে এমন বর্বরোচিত আচরণ করা হয়? ওদের কি দাওয়া দেয়া উচিত নয়?’’* **না।** ওরা আমাদের জায়গায় এসেছে, ওদের সাথে এমন আচরণই করা উচিত। তাদেরকে তাদের জায়গায় দাওয়াহ দিব। যদি তারা সেনাবাহিনী নিয়ে আসে, তবে ওদের সাথে সমান শক্তি নিয়েই মিলিত হওয়া উচিত, যদি কোন স্থানে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করা হয়।

যেমন ইবন তাইমিয়্যাহ رحمهالله বলেছেন, **‘‘মুনাফা রক্ষার চেয়ে মূলধন রক্ষা করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’’** এখানে মুসলিমরা হচ্ছে মূলধন আর মুনাফা হচ্ছে যা দাওয়া দেয়ার মাধ্যমে লাভ করা যায়। অতএব, মুনাফা রক্ষার চেয়ে মূলধন রক্ষা করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যদি কোন মুসলিম ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করে আর ইসলাম প্রচার করতে চায়, তবে তাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে, **জিহাদ যেকোন সময় ও কালের জন্য উপযুক্ত।** ব্যাপারটা এমন নয় যে, মুসলিমরা সমগ্র বিশ্বে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায়, বরং জিহাদ যেকোন সময়-কালের জন্য উপযুক্ত , যখন এর শর্ত ও পূর্বশর্তগুলো থাকে। সমগ্র মুসলিমের এই ঈমান থাকা উচিত যে, **জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে এবং আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি য়ে আজ কোথাও না কোথাও জিহাদ চলছে।**

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর দু’ধরনের শর্ত রয়েছে-

১) শরীয়াগত শর্ত
২) কৌশলগত শর্ত

এ ধরনের বিবেচনা থাকলে যে কেউ মুক্তভাবে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ইবাদত করতে পারবে, কেননা এক্ষেত্রে একে কোন নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হচ্ছে না। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ বলে যে, *'যদি তোমরা ফিলিস্তিন দখলদারী ইসরাঈলীদের সাথে যুদ্ধ করতে চাও, তবে কেবল ফিলিস্তিনেই করতে পারবে এবং পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে নয়'।* এটা একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণা। কে বলেছে যে, তারা মুসলিমদের সাথে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, তা কেবল তাদের দখল করা এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে? যদি কোন নির্দিষ্ট গোত্র ও জাতি শরীয়াহ অনুযায়ী আহলুল হারব হিসেবে আখ্যায়িত হয়, তবে এটা সমগ্র পৃথিবীর বুকেই তাদের এই নাম প্রযোজ্য। এটা কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিমরা মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গিয়েছিল, কেউ বলে নি যে, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে তা কেবল মক্কায়ই করতে হবে, অন্য কোথাও না। রসূল ﷺ মদীনায় তার ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে সব যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

মদীনা রসূল ﷺ এর খুব একটা পছন্দের কোন স্থান ছিল না, অথচ ইসলাম সেখানেই ছাড়িয়ে ছিল। রসূল ﷺ *কোন স্থান অনুযায়ী ইসলামকে পরিবর্তন করেন নি, বরং ইসলাম অনুযায়ী সেই স্থানকে সাজিয়ে ছিলেন।* **এটা পাশ্চাত্যের মুসলিমদের কথার ঠিক উল্টো।** তারা বলে যে, যেহেতু আমরা পাশ্চাত্যে থাকি অতএব আমাদের *পশ্চিমা ইসলাম* বা *আমেরিকান ইসলাম* দরকার। যার অর্থ মুসলিমরা অন্য যেকোন আমেরিকানদের মতই তাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী চলতে পারবে। যদি অনুভব করেন যে, ঐ স্থানে থাকতে হলে *আপনার ইসলামকে পরিবর্তন করতে হবে,* তবে বুঝতে হবে যে, আপনার ঐ স্থান থেকে হিজরত করা **অত্যন্ত জরুরী।**

যদি আপনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতে না পারেন, তবে ঐ স্থান থেকে আপনার হিজরত করতে হবে।
রসূল ﷺ কখনও বলেননি যে,
আমার মক্কায় থাকা উচিত,
ভাল নাগরিক হওয়া উচিত,
কিছু দাওয়ার কাজ করা উচিত,
চরমপন্থী প্রচার করা থেকে বিরত হয়ে তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও ইলাহ সম্বন্ধে খারাপ কথা বলা ত্যাগ করা উচিত, যাতে করে তারা ইসলামকে ভালবাসে।

না, বরং রসূলুল্লাহ ﷺ **ইসলামকে এর পূর্ণরূপে তুলে ধরেছিলেন** এবং বলেছিলেন যে, **এর উপর তার কোন হাত নেই এবং তিনি একে পরিবর্তনও করতে পারবেন না।** আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বলেছেনঃ

(يَاأَيُّهَاالرَّسُولُبَلِّغْمَاأُنْزِلَإِلَيْكَمِنْرَبِّكَوَإِنْلَمْتَفْعَلْفَمَابَلَّغْتَرِسَالَتَهُوَاللَّهُيَعْصِمُكَمِنَالنَّاسِإِنَّاللَّهَلَايَهْدِيالْقَوْمَالْكَافِرِينَ)

‘‘হে রসূল! তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর।যদি না কর, তবে তো তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না।আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথকে পরিচালিত করেন না। ’’ (সূরা আল-মায়িদাঃ ৬৭)

►একটি গোত্র ইসলাম কবুল করতে রাজী হল **কিন্তু এক শর্তে যে,** রসূলের ﷺ মৃত্যুর পর তাদের ক্ষমতা দিতে হবে। রসূল ﷺ রাজী হলেন না, কারণ এই পৃথিবী আল্লাহর এবং কে এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, তা নবীদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

►আরেকটি গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দিতে রাজী হল কিন্তু তারা বলল যে,
পারস্য সাম্রাজ্য থেকে একে সুরক্ষা দিতে তারা অপারগ। অন্য আরব গোত্র থেকে একে সুরক্ষা দিতে তারা রাজী আছে। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন যে, *এই দ্বীন কেবল তারাই বহন করতে পারবে, যারা একে সবদিক থেকে ঘিরে রাখবে অর্থাৎ সর্বদিক থেকে সুরক্ষা দিবে। হয় তোমরা এই দ্বীনকে সবদিক থেকে সব আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে নতুবা তোমরা তোমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পারলে না।*
অতঃপর রসূল ﷺ এই **প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।**

►এরপর রসূল ﷺ মদীনাবাসীদের তাঁর সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহী দেখলেন। তারা রসূলকে ﷺ জিজ্ঞাসা করলোঃ ‘‘এর প্রতিদানে আমরা কি পাবো, ইয়া রসূলুল্লাহ্?’’ তিনি বললেন, **‘‘জান্নাত’’** আনসাররা তাঁর এই উত্তরে ভীষণ খুশী হল এবং বললঃ ‘‘কতইনা লাভজনক বানিজ্য ! আমরা কখনই এর থেকে পিছু হঠব না।’’

অনেক পাশ্চাত্য মুসলিমই **উসূল আল ফিকহকে পরিবর্তন** করে নতুন ফিকহ্ তৈরী করতে চায়, যাতে করে **ইসলাম পাশ্চাত্য আদর্শকে গ্রহণ করে** নেয়। এমনকি তারা কিছু **আক্বীদা বাদও দিয়ে দেয়** কারণ তা পাশ্চাত্যের জন্য খুবই চরমপন্থী। এমনকি কিছু ইবাদত বাদ দিয়ে দেয়া হয়। মূলতঃ তারা **পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামকে পরিবর্তন** করে ফেলছে এবং নিঃসন্দেহে এ রকম ইসলামকেই পাশ্চাত্যরা প্রচার করবে এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

সাহাবাগণ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ইসলামের প্রসার ও প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রসূল ﷺ এর পথ অনুসরণ করেছিল। সাহাবাগণ যে কারণে মদীনা ত্যাগ করেছিল আর যে কারণে মক্কা ত্যাগ করেছিল তা এক ছিল না। বরং তারা মদীনা ত্যাগ করেছিল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য।

- ✓ **ইমাম মালিক** رحمه الله তার মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন সালমান আল ফারসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে তার প্রিয় বন্ধু আবু দারদার রাদিয়াল্লাহু আনহু লেখা চিঠি **''এই পবিত্র ভূমিতে এসো'** সালমান আল ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিয়েছিলেন, **''কোন পবিত্র ভূমি মানুষকে পবিত্র করে না বরং তার আমল-ই তাকে পবিত্র করে তুলে।''** (মুয়াত্তাঃ গ্রন্থ ৩৭ নং ৮, ৭)

তাঁরা জিহাদকে কেবল মক্কা বা মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে রাখেননি, বরং বিশ্বের যেকোন স্থানে যখনই এর পূর্বশর্তগুলো পূরণ হবে, তখনই জিহাদ হবে।

> **ইমাম শাফেয়ী** رحمه الله বলেনঃ ''বছরে নূন্যতম অন্তত একবার জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত আর এর বেশি তো অবশ্যই উত্তম। একটি বছর চলে যাবে অথচ কেউ জিহাদ করবে না- এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়, কিছু ব্যতিক্রম অবস্থা ছাড়া যেমন- মুসলিমদের দূর্বলতা ও শত্রু পক্ষের সংখ্যাধিক্য, অথবা প্রথমে আক্রমণ করলে বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা অথবা সংস্থানের অভাব (যেমন-অর্থ , সরঞ্জাম, জনশক্তি ইত্যাদি) অথবা অনুরূপ ওজর। তা না হলে কোন প্রয়োজন ছাড়া কাফিরদেরকে এক বছরের বেশী সময় ধরে আক্রমণ না করে থাকাটা মেনে নেয়া যায় না।''

আল হারামাইনের ইমামবলেছেন, ''আমি উসূলের আলিমদের মতামত গ্রহণ করি। তারা বিবৃতি দিয়েছেন যে, জিহাদ অবশ্য পালনীয় এবং এটি জারী রাখতে হবে সামর্থ্য অনুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বে শুধু মুসলিম বা যারা মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পন করে ফেলেছে এমন ব্যক্তিরা থাকে। অতএব, জিহাদ কেবল বছরে একবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা সম্ভব হলে আরও ঘন ঘন করতে হবে। ফিকহ্'র আলিমগণ এমন উক্তি করেছেন, কারণ কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে যে সময় লাগে তা-ই জিহাদকে বছরে একবারে নামিয়ে আনে।''

ইমাম হাম্বলী رحمه الله মতালম্বী একজন তার আল-মুগনী গ্রন্থে বলেনঃ ''নূন্যতম জিহাদ হচ্ছে বছরে একবার। অতএব প্রতি বছরই জিহাদ করা আবশ্যক। যদি কখনও বছরে এর চেয়ে বেশি জিহাদ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে মুসলিমদের উপর তা অবশ্য পালনীয় হয়ে দাড়ায়।''

আল কুরতুবী رحمه الله তার তাফসীরে বলেছেনঃ ''এটা ইমামের উপর আবশ্যক যে, সে প্রতি বছরই শত্রুর জায়গায় একটি হলেও বাহিনী প্রেরণ করবেন এবং ইমামকে স্বয়ং এসব যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি তা

সম্ভব না হয়, তবে অন্ততপক্ষে এমন একজনকে পাঠাতে হবে, যাকে তিনি বিশ্বাস করেন বা যে তার আস্থাভাজন। যে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাবে, **(তাদের) ক্ষতি থেকে (মুসলিমদের) দূরে রাখবে,** আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় দিবে, যতক্ষণ না তারা (পরিপূর্ণরূপে) ইসলামে প্রবেশ করে বা জিজিয়া দেয়।''

লক্ষ্য করুন, আল কুরতুবী رحمهالله বলেছেন যে, **সৈন্যবাহিনী পাঠানোর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে (নিজেদের) থেকে শত্রুর ক্ষতি দূরে রাখা।** এটি ইঙ্গিত করে যে, মুসলিমরা কখনই নিজেদের জীবনে শান্তির স্বাদ পাবে না, যদি না তারা আল্লাহর শত্রুদের তাদের এলাকায় আক্রমণ করে। আজকে আমরা এই দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি দেখছি, এর চরম মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে প্রতি পদে পদে। আপনি যদি শয়তানকে বাধা না দেন বা না থামান, তবে সেও আপনাকে ছেড়ে দেবে না।

জিহাদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদ কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল নয়

জিহাদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ জিহাদ কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল নয়

আরও একটি সমস্যা মানুষের মাঝে রয়েছে। আর তা হল, যখন কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা বলে যে, ***জিহাদ করে ঠিক কাজ করেছে***এবং তারা যদি কোন যুদ্ধে পরাজিত হয় তবে বলে যে, ***তারা যুদ্ধ করে ভুল করেছে !***এটি একটি গুরুতর সমস্যা। এ কারণে লেখক এই বিষয়টি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

সাধারণ মানুষ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জিহাদের বিষয়টি উপলব্ধি বা অনুধাবণ করতে চায়। যদি একদল মুজাহিদীন কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করে তখন মানুষ বলে যে, *তারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।* আর যদি তারা কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে তারা ভুল পথে রয়েছে বলে মনে করে। এটি একটি ভুল উপলব্ধি।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ **একদল আম্বিয়াকে কেয়ামতের দিন দেখবেন যাদের কোন অনুসারী থাকবেনা।** এটা মানে কি যে সেসব আম্বিয়াগণ ব্যর্থ? **না,** বরং তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, পূর্ণরূপে, কিন্তু কেউ তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। যদি তাঁরা একজনকেও না পায়, তার সাথে ব্যর্থতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, হিদায়াত আল্লাহর হাতে এবং কোন আম্বিয়া বা অন্য কারও হাতে না। আমরা কি বলতে পারি, রসূলুল্লাহ্ ﷺ দাওয়াহ্ **তাঁর নিজ চাচা আবু তালিবের ক্ষেত্রে ব্যর্থ** হয়েছিলেন**?** একটুও না। তিনি তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন এবং তাঁর থেকেও বেশি করেছেন। তাঁর চাচার অন্তর আল্লাহর হাতে ছিল, রসূলুল্লাহ্ ﷺ - এর হাতে নয়।

আমাদের ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা আছে।
যেখানে মুসলিমরা কোন এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হয় এবং তাদেরকে বলা হতো যে, *তারা আর কখনও নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারবে না।* এগুলোর মাঝে সবচেয়ে জঘন্যতম যুদ্ধ ছিল আত-তাতারদের সাথে হিজরী ৬৬৬ সালে। যখন তাতাররা ইরাকের আশ শামে প্রবেশ করেছিল এবং ৪০ দিন অবস্থান করেছিল, তারা **সেই ৪০ দিনে ১০ লক্ষ**এর উপর মানুষকে হত্যা করেছিল। যা গড়ে **প্রতিদিন প্রায় ২৫, ০০০ জন** হয়। তারা তখন আশ-শামের ভিতর অগ্রসর হতে থাকে এবং প্রতিটি

যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজিত করতে থাকে। মুসলিমরা সে সময় ভীষণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা অনুভব করছিল যে, তাতাররা *একটি অপরাজেয় জাতি* এবং তাদেরকে *পরাজিত করা অসম্ভব।* তাদের (তাতারদের) আর কিছু জায়গা দখল করতে বাকি ছিল, যাতে তারা পুরো মুসলিম সাম্রাজ্য দখল করতে পারত। কিন্তু কি ঘটেছিল? *হতাশাবাদীদের পরিণতির সামনেই আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন আশাবাদীদের পরিণতি ! সিরিয়ায় মুসলিমরা হতাশায় আক্রান্ত হয়ে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো অথচ মিশরের মুসলিমরা উঠে দাঁড়ালো, লড়াই করল আর আল্লাহ তাঁদেরকেই বিজয়ী করে দেখিয়ে দিলেন।* আল্লাহ্‌ মুসলিমদের এই পরীক্ষা দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তারা তাদের দো'আ এবং জিহাদের ক্ষেত্রে আন্তরিক হয়। তারা তখন তাতারদের **'আইন-জালুত'** যুদ্ধে পরাজিত করে। এটি একটি সংকটময় পরাজয় ছিল এবং সেই সাথে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আবর্তন। যখন মুসলিমরা জয় লাভ করল, তারা তাদের শক্তির জন্য জয়লাভ করেনি। যেহেতু তারা তাদের অধিকাংশ শক্তি তাতারদের কাছে হারিয়েছিল।

সুতরাং কেউ যদি যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে তর্ক করে যে, মুসলিমদের প্রথমদিকে জয় লাভ করা উচিত ছিল, যেহেতু তাদের সৈন্যবাহিনী পরিপূর্ণ ছিল এবং তাদের প্রচুর সম্পদও ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে **শেষ সময় যখন তারা জয় লাভ করেছিল, তাদের সৈন্যসংখ্যা কমে গিয়েছিল এবং সম্পদও সীমিত হয়ে পড়ে।** কেউই কখনও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বা যুক্তির আঙ্গিকে জয় পরাজয় ব্যাখ্যা করতে পারেনা। মুসলিমরা তাদের সংখ্যা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে জয় লাভ করে না। তারা আল্লাহর ইচ্ছায় জয়লাভ করে। **জয় আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার।**

আমাদের প্রস্তুতিঃ

আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে, অতঃপর লড়াই করতে হবে। যদি আমরা হেরে যাই, আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এবং আমাদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-তে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের যে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল তা পূর্ণরূপে পালন করেছি। এক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর উপর ফলাফল ছেড়ে দেই। যদিও প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত আজ যখন যুদ্ধের পদ্ধতিতে উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং সেই সাথে হয়েছে জটিলতর হয়েছে। কোন মুসলিম যদি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র ব্যাপারে অত্যন্ত প্রত্যয়ী হয় , তাহলে তার প্রস্তুতির জন্য সময় দেয়া প্রয়োজন। কোন মুসলিম যদি পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে পরাজিত হয়, তবে সে জন্য সে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

উপরন্তু কোন মুসলিম যদি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-র জন্য **একেবারেই প্রস্তুতি গ্রহণ না করে**, তবে সে অনুরূপ কাজের কারণে বা অনুরূপ অবস্থায় **পাপ অর্জন করছে**, কারণ যখন **জিহাদ ফারদ্ আল-আইন, তখন প্রস্তুতিও ফারদ্ আল আইন এবং জিহাদ যখন ফারদ্ আল কিফায়াহ্ তখন প্রস্তুতিও ফারদ্ আল কিফায়া**।সুতরাং জিহাদের প্রস্তুতির হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। যদি আমরা বলি যে জিহাদ যুদ্ধের উপর নির্ভর করে, তবে তা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং হতাশা বিস্তৃত হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবেই কাজ করবে। আমরা আমাদের সংখ্যা বা প্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ করছি না।

এটা সম্ভব যে আমাদের সংখ্যা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের শত্রুদের থেকে বেশি এবং তবুও আমরা পরাজিত হয়েছি। কেন? কারণ আমরা জয়লাভের শর্তসমূহ পূর্ণ করিনি। আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে চান । তখন আমরা ইনশাআল্লাহ্ জিতব।

► আমরা জয়লাভের জন্য দায়বদ্ধ না।আল্লাহ্ আমাদের যে কাজের আদেশ দিয়েছেন আমরা সেই কাজ পালন করি কিনা, আমরা সে ব্যাপারে দায়বদ্ধ।আমরা জিহাদের জন্য যুদ্ধ করি, কারণ তা আমাদের উপর ফারদ্। আমরা জয়লাভ বা পরাজয় বরণ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করি না।

আমাদেরকে প্রস্তুতি এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ইবাদত পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমাদের অংশের দায়িত্ব পালন করতে হবে, অতঃপর আমাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। ঠিক যেমনি করে ‘বদরের’ যুদ্ধের আগে রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যা করার তাই করেছিলেন,

যেমন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা,
মুসলিমদের যুদ্ধ করতে উৎসাহ প্রদান করা,
পদমর্যাদা বিস্তৃত করা,
সঠিক জায়গা নির্বাচন এবং আরও অনেক কিছু।

যখন তা সব করা শেষ হল, তখন তিনি কি করলেন? তিনি একটি আলাদা নির্জনে চলে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে একটি দীর্ঘ দো‘আ করলেন; যাতে আল্লাহ্ মুসলিমদের বিজয় দান করেন।

জিহাদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ বিজয় শুধু সেনাবাহিনীর বিজয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়

জিহাদের পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ বিজয় শুধু সেনাবাহিনীর বিজয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়

জয়লাভের বিষয়টিকে আমাদের **ভাষাগত** এবং **প্রথাগত** জয়লাভের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ইসলাম তাই শব্দটিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে। ইসলাম অনেক পুরানো শব্দের পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে সলাত বলতে দু'আ বুঝানো হত। কিন্তু ইসলামের আগমনের সাথে সাথে এবং তার একটি নতুন অর্থ প্রদান করে এবং সে অর্থেই আগে আমরা সলাতকে বুঝি, ইবাদত অর্থে। সিয়াম বলতে বুঝাতো কোন কিছু বর্জন করা। যেখানে ইসলাম এই অর্থ পরিবর্তন করে এইভাবে সংঙ্গায়িত করে যে, সুবহে সাদিক হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় হতে বিরত থাকা। সুতরাং আমরা যখন বিজয়ের কথা বলি, আল্লাহ তায়ালা বিজয়ের একটি নতুন অর্থ দিয়েছেন।

মুসলিমদের একটি বড় অংশ মনে করে যে, মুসলিমদের জয় বলতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে **শারীরিক জয়কে** বোঝায়। আমরা যদি নিবিড়ভাবে কুরআন অধ্যায়ন করি তাহলে আমরা দেখি যে, আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের বিজয়ের ওয়াদা করেননি। একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, এর মানে এই নয় যে সে প্রতিটি যুদ্ধেই জয় লাভ করবে। আল্লাহ্ মহামহিম বলেনঃ **''যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছে মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই যাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমগণকে পছন্দ করেন না''** (সূরা আলে-ইমরানঃ ১৪০)

এই আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল, তখন তারা অবাক হয়েছিল যে, তারা কেন হেরে গিয়েছিল? কারণ 'বদরে' তাদের কৌশল এবং বিজয় তাদেরকে ভাবতে শিখিয়েছিল যে তাঁরা সব যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। সুতরাং আল্লাহ্

তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে **এটা তার ইচ্ছা।** একদিন তোমরা জয়লাভ করবে, একদিন তোমরা পরাজিত হবে। এই আয়াত এজন্যই নাযিল হয়েছে যে, আমরা যেন দেখি যে আল্লাহর এই বিধান চলতে থাকবে।

আমরা যদি আমাদের পরিধীকে আরো প্রশস্ত করি, তাহলে আমরা অনুধাবন করতে পরবো যে, যে কেউ ইসলামের চূড়ায় (জিহাদ) পৌছাবে, তারা কখনও পরাজিত হবে না বরং সর্বদাই জয়ী হবে, তবে এক্ষেত্রে সবসময় শারীরিভাবে জয়ী হওয়া শর্ত নয়।

ইসলামে বিজয়ের ১১ টি অর্থ রয়েছেঃ

বিজয়ের প্রথম অর্থঃ ৮টি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিজয়

সবচেয়ে বড় বিজয় হল নিজের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার বন্ধনের বিরুদ্ধে বিজয়। মুজাহিদীনরা এক্ষেত্রে বিজয় লাভ করে যেখানে উম্মতের অধিকাংশই তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ তে যাওয়ার ব্যাপারে এবং ত্যাগ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেনঃ **''বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বজাতি, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।''**(সূরা আত-তওবাঃ ২৪)

এখানে একজন মুসলিম এবং জিহাদের মাঝে ৮টি প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অন্য প্রতিবন্ধতা থাকলে এগুলোর সাথে সম্পর্ক যুক্তই হবে। দেখা যাক প্রত্যেক প্রতিদ্ধকতা।

১) **তোমাদের পিতাঃ** বর্তমান সময় ইসলামের প্রতি দায়িত্ব পালনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে উম্মাহ্ বেশ দূর্বল। তারা বলে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসে কিন্তু তারা সত্যিকার অর্থে জানেনা যে, আল্লাহ্ তাদের কাছে কি আশা করেন এবং তাদেরকে কিসের হুকুম করেন। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ বর্তমানে **একটি ফারদ্ (আবশ্যিক)।**

যদিও খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে দেখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা শ্রেনী উম্মাহর মাঝে একটি বড় প্রতিবন্ধক। পিতারা তাদের পুত্রদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয় না। উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ *''যদি আমরা আমাদের পিতাদের অমান্য না করতাম, আমাদের কেউই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্-য় অংশ গ্রহণ করতে পারতাম না।''*

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এক্ষেত্রেএকটি গুণ, যেহেতু সে আল্লাহ-কে মান্য করেছে

এছাড়া যা শরীয়াহর সাথে একই রেখায় অবস্থিত তার সবকিছুই মান্য করতে হবে। যখনই সেগুলোয় সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তখন সকলকে আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিতে হবে। সুতরাং এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, সে পিতা-মাতার সাথে আল্লাহর জন্যই সম্পর্ক বজায় রাখে। এটা আল্লাহ্-কে সন্তুষ্ট করার একটি উপায় মাত্র ।

২) তোমাদের সম্মানঃ প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছেই নিজের সম্মান অত্যন্ত প্রিয় । রসূল ﷺ বলেনঃ *''সম্মান তোমাদের কৃপণতা বা নীচতা এবং কাপুরুষতার কারণ।''* এই দু'ধরনের অসুখই মানুষকে আক্রান্ত করে শুধু তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্ চান। কেন পিতা-মাতা কৃপণ হয় ? যেহেতু সম্মান হওয়ার পরপরই তাদের পোশাক, খাবার, খেলনা ইত্যাদির জন্য এত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় যে, অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের হাত সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা একই সাথে মানুষকে দ্বিতীয়বার ভাবতে শিখায়। যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ''কেন তুমি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্যে বাইরে বেড়িয়ে পড়ছো না?'' তারা উত্তর দেয়, *''আমার পরিবারের দেখা শোনা করাই আমার জিহাদ!''* **সে বোকার মত নিজেকে মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ মনে করে।** তার পরিবার তার জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ পালন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। এটা দূর্ভাগ্যজনক যে, এই অসুখ তাদের মাঝেও পৌছে গিয়েছে যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ বোঝে এবং যারা একসময় মুজাহিদীন ছিল কিন্তু তারা বিবাহ করার, সম্মান গ্রহণ এবং অন্য যেকোন কারণে তাদের পিছনে থেকে যাওয়ার বাহানা হয়ে দাড়ায়। এটা একটি ফিৎনা যা তাদের নিচে নামিয়ে দেয়। কাজেই যাদের ফিরে যাওয়ার জন্য পরিবার রয়েছে তাদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পালনে দ্বিগুণ প্রতিদান পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সাহাবাদের দিকে চেয়ে দেখ, তাঁরা অধিকাংশ ফিৎনার মুখোমুখী হয়েছেন। তারা একের অধিক স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। তাদের এক বা দু'এর অধিক সম্মান ছিল এবং পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণ ছিল সীমিত। তবুও তারা সর্বোচ্চ পদক্ষেপ জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় অংশ নিয়েছিলেন।

যখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন, কিছু সংখ্যক মুসলিম পিছনে থেকে গিয়েছিল, যেহেতু তাদের অন্তর তাদের পরিবারের দেখা শোনা করার জন্য পরিবারের মাঝেই বন্দী হয়ে গিয়েছিল, যদিও হিজরত করা তখন ফারদ্ আল- 'আইন ছিল। সপ্তাহ চলে গেল, এক এক করে মাস, বছর কেটে গেল এবং ক্রমান্বয়ে মুসলিমরা মক্কা জয় করে। **এই মুসলিমরা যারা পিছনে থেকে গিয়েছিলসবচেয়ে বড় সুযোগই তারা হারালো।** রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করা, রসূলুল্লাহ্ ﷺ হালাকাগুলোতে অংশগ্রহণ করা, মসজিদে আন-নববীতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খুত্বাহ অংশগ্রহণ করা, রসূলুল্লাহ ﷺ এর তারবিয়্যাহতে অংশগ্রহণ, মদীনার ইসলামিক গোষ্ঠীর সাথে বসবাস এবং এরূপ আরও কত কিছু। তারা এত কিছু হারিয়েছে শুধু একটি কারণে যে তারা হিজরত করেনি। ইবনুল কাইয়্যুম رحمه الله বলেনঃ *''সৎকর্ম বাড়তে থাকে এবং গুনাহসমূহও বাড়তে থাকে।''*

হিজরত না করা একটি পাপ ছিল যা বেড়ে গিয়েছিল। তারা এমন কত কিছু যে হারিয়েছিল। ভাল কাজের বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উদাহরণ হল যে, একজন মসজিদে যাওয়ার এবং জামা'আতে প্রার্থনা করার জন্য মনস্থ করল। সুতরাং মসজিদের পথে প্রত্যেক পদক্ষেপে সে আজর লাভ করে। প্রত্যেকবার সে যখন তার ভাইদের সাথে হাত মিলায়, সে আজর প্রাপ্ত হয় এবং তার গুণাহসমূহ ঝড়ে পড়ে। সে তাহিয়্যাতুল মসজিদের সলাতের জন্য আজর প্রাপ্ত হয়। সে সুন্নাহ্ সলাতের জন্য আজর প্রাপ্ত হয়। সে জামা'আতের সলাতের জন্য আজর প্রাপ্ত হয়। অতঃপর সে গৃহের ফিরতি পথে প্রতি পদক্ষেপে আজর প্রাপ্ত হয়। আর গুণাহসমূহ বৃদ্ধি লাভ করার উদাহরণ হল, একজন মদ খায় এবং মাতাল হয়। সে তখন জিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর সে বাইরে যায় এবং অন্যকে হত্যা করে। অতঃপর সে গাড়ি চালাতে গিয়ে দুঘটনার শিকার হয় এবং মদ্যপ হওয়ার কারণে অন্যকে হত্যা করে।

সুতরাং মক্কার মুসলিমরা দেখল যে, এসব মুসলিমরা যাঁরা মক্কা বিজয় করেছে সম্মানের দিক দিয়ে তারা অধিকতর মহান। তাঁরা অনেক বেশি শুদ্ধ। তাঁদের জ্ঞানের পরিধিও বেশি। তাঁরা কুরআনের অধিকাংশ মুখস্ত করেছে, যেখানে মক্কার মুসলিমরা মাত্র কয়েক আয়াত জানে। তাঁরা বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। সুতরাং এসব মুসলিমরা তাদের পরিবার নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, যারা তাদের পিছনে থেকে যাওয়ার কারণ। আল্লাহ্ তখন কুরআনের আয়াত নাযিল করলেনঃ **''হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সম্মান-সন্ততিগণের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে..।''** (সূরা তাগাবুনঃ ১৪)

পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে যারা তোমার সবচেয়ে কাছের দেখাচ্ছে, হতে পারে সত্যিকার অর্থে, তারা তোমাদের বড় শত্রু। তারা তোমার জিহাদের সময় তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তখন এসব মুসলিম গৃহে গমন করে **লাঠি নেয়** এবং তাদের **স্ত্রীদের ও সন্তানদের প্রহার করতে শুরু করে**এই বলে যে, *''দেখ তোমরা আমার কি করেছ? আমি তোমাদের জন্য সব আজর লাভে ব্যর্থ হয়েছি"।* তখন আল্লাহ্ বাকি আয়াত নাযিল করলেনঃ
(...وَإِنْتَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّاللَّهَغَفُورٌرَحِيمٌ)

''....তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা কর,তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর, তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'' (সূরা আত-তাগাবুনঃ ১৪)

এখন তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর কোন বেদম প্রহার তোমাদের জন্য কোন ভাল কিছু বয়ে আনবে না। এটা কোন কিছু পরির্তন করতে পারবে না। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। সর্বোচ্চ যা তুমি করতে পারো তা হল, তাদের ক্ষমা করতে এবং কাজে লিপ্ত হতে। সুতরাং আমাদেরকে পরিবার সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে, কারণ তারা আমাদের উপর অবশ্যকরণীয় ইবাদত জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে।

৩) **তোমাদের ভাইঃ**এটা হতে পারে যে তারা তোমার জন্য একটি বাধা, হতে পারে তারা তোমাকে সমর্থন করছে না বা সাহায্য করছে না বা তারা তোমার বিষয় সমূহের যত্ন করছে না, যা তুমি পিছনে ফেলে এসেছ।

৪) **তোমাদের আত্মীয়-স্বজনঃ** বর্তমান সময়ে আমরা এটাকে জাতি বলে অভিহিত করি বা স্বদেশ ভূমি, দেশ এবং জাতীয়তাবাদ, এসব কিছুই প্রতিবন্ধক, মানুষ অবশ্যকরণীয় জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পূর্বে জাতি সত্তার গুরুত্ব দেয়। মানুষ বলে, তাদের জাতির মাঝে শান্তি বজায় রাখা কেন প্রয়োজন? কারণ এটি জাতির একটি মাসায়েল। এটা বলা ভুল, প্রথমত, **আমাদের দ্বীন এর মাসায়েল**দেখতে হবে, **জাতির নয়,** বিভিন্ন জাতি আসবে যাবে। কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করতে হবে।

অনেক ভাই এবং ইসলামিক জামা'আহ আছে যারা জাতির বিভিন্ন সমস্যা প্রতিহত করার নামে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ হতে বিরত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মুসলিম দেশের কতিপয় মুসলিমরা বলে যে, *তারা জিহাদ চায় না, কারণ এর ফলে কুফফাররা আসবে এবং তাদের সমস্যা সৃষ্টি করবে।* এটা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই হতে পারেনা। তোমাকে তাই করতে হবে যা আল্লাহ্ তোমাকে দিয়ে করাতে চান এবং ফলাফলের জন্য দুঃখ করা যাবে না। এটা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, অথবা তাদের অন্তর

ইসলামের জন্য খুলে দিতে পারেন।

তুমি এ ব্যাপারে চিন্তিত হয়ো না। **তুমি বিশ্বচালক নও।** আল্লাহ্ আমাদেরকে তার জন্য যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা জাতির পতাকার নিচে যুদ্ধ করে। এটা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ নয়। তারা শোনে যে তাদের কুরআনের অবমাননা করা হচ্ছে ,অথচ তারা কিছুই করে না। তারা জানে মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়, তবু তারা কিছুই করে না। কিন্তু যদি তাদের প্রেসিডেন্ট বা রাজা তাদেরকে কোন মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে, তারা সারি বেঁধে দাড়ায় এবং যুদ্ধ করে। যেমনঃ বিভিন্ন দেশের পোষা সেনাবাহিনী, তারা তাদের প্রেসিডেন্টের প্রতি বেশি অনুগত অথচ আল্লাহর দীনের অপমান তাদের গায়ে লাগে না যতটা লাগে তাদের জাতির অপমান। **তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে না।**

৫) সম্পদ যা তুমি অর্জন করেছো এবং সেই ব্যবসা যেটার লোকসান হবার ভয় কর। এখানে দু'টি প্রতিবন্ধকতা আছে যা সম্পর্ক যুক্ত। সেই **সম্পদ** যার সাথে তুমি রয়েছো। যে **নগদ অর্থ** তোমার আছে এবং যে **ব্যবসা** তোমার আছে। কিছু মানুষ পিছিয়ে থাকে এবং দোকান, রেস্তোরা, এমনকি তাদের **অধীনস্থদের** জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লায় অংশগ্রহণ করে না, এসবই প্রতিবন্ধক। কেউ আবার **সামাজিক মর্যাদা** যেমন- ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কারণে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহয় অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ফারদ্-আল- 'আইন হলে তুমি উদাসীন ভাবে বসে থাকতে পারনা। হ্যাঁ, আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেউ কি বলতে পারে যে, *''আমি ডাক্তার হওয়ার জন্য সলাত ও সীয়াম পালন করব না?''* **কেউ কি তা বলে?** জিহাদ এবং সলাত এবং সাওমে কোন পার্থক্য নেই। **এসবই ইবাদত।**

যখন সাহাবীগণ এই মর্মে বাইয়্যাত নিল যে, তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেভাবে নিরাপত্তা দিবে, যেভাবে তারা তাদের পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তখন তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটল। তারা তাদের ব্যবসা ক্ষেত্র বা খামারের যত্ন নিতে পারত না, যদিও সেগুলোর ভাল যত্নের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তাদের আয়ের উপর বিশেষ প্রভাব পড়ল। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা জয় করলেন এবং তারা বলল, ''আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা সবসময় রসূলুল্লাহ্ ﷺ সমর্থন করছি এবং এখন তাঁর জন্মভূমি যুক্ত হয়েছে এবং **এখন আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের খামারের দেখা শোনা করতে পারি।** আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেনঃ **''তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন''** (সূরা আল-বাকারাঃ ১৯৫)

যা আনসাররা করতে যাচ্ছিল **তা আল্লাহর পক্ষ হতে ধ্বংস হিসেবে**ঘোষিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে তারা যা করতে চেয়েছিল, তা হল ফিরে গিয়ে নিজেদের খামার-এ কাজ করা । কিন্তু আল্লাহ্ একে ধ্বংস বললেন, যদিও জিহাদ তখন ফারদ্ কিফায়া। আবু আইয়্যুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ ''এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হয়েছিল, যারা ছিল একদল আনসার। যখন আল্লাহ্ তাঁর রসূল ﷺ-কে সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব দান করলেন, আমরা বললাম, চল আমরা আমাদের সম্পদের কাছে ফিরে যাই এবং এর উন্নতি করি।'' (সুনান আবু দাউদ)

৬) **বাসগৃহ যা তোমাকে প্রশান্তি দেয়ঃ** গৃহের আরবী শব্দ 'মাসকান', 'মাসকান' শব্দ 'সাকিনা' হতে এসেছে। যখন আমরা গৃহে অবস্থান করি, তখন শান্তি ও উদ্বেগ মুক্ততা অনুভব করি । আমরা প্রাকৃতিকভাবে আমাদের বাসগৃহের সাথে আবদ্ধ থাকি, বিশেষত আমাদের গৃহের কিছু আচার ব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যেমন- যে খাদ্য আমরা খাই,
যে বিছানায় আমরা শুই,
যে সময়সূচী আমরা অনুসরণ করি।

যা কিছুই এই নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ব্যঘাত ঘটায়, তা কোন প্রশান্তি নয় বরং নিরাপত্তাহীনতা। একজন মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহর এই নির্দিষ্ট কর্মসূচীর পরির্বতন হয়। সে এমন খাদ্য খায় যা তার ঘরে খাওয়া খাদ্যের অনুরূপ নয়। সে যে বিছানায় শোয় তা আরামদায়ক নাও হতে পারে, তার ঘুমের সময়সূচীর পরিবতর্ন হতে পারে। এসবই তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং একজন আরব মুজাহিদ যে কোন আফগানের সাথে যুক্ত হবে, সে খাদ্যকে খুব ঝাল হিসেবে দেখবে, তাপমাত্রা এবং কর্মসূচীর পরিবর্তন দেখবে।

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবের বাইরে এসে আরমেনিয়ায় এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি **কয়েক ফুট বরফে যুদ্ধ করেছেন** এটা মোটেও সহজ নয় এবং অবশ্যই তা একটি ত্যাগ স্বীকার। আর এজন্যই হয়ত হজ্জ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদিও হজ্জ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। মানুষকে তার সময়সূচীর পরিবর্তন করতে হয়। যে পোশাক হজ্জে পড়া হয়, তা প্রতিদিনের ব্যবহার্য পোশাক নয়। তুমি চুল ও নখ কাটতে পারবেনা। এসবই হলো ফিতরার সুন্নাহ। কিন্তু তুমি এসব করতে অনুমতি প্রাপ্ত নও। হজের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। যদি তোমার গৃহের প্রতি

ভালবাসা থাকে এবং তুমি তীব্র আকাঙ্খী হও এবং এ কারণে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ হতে দূরে থাক, তখন এটা একটি প্রতিবন্ধকতা। মাঝে মাঝে কোন মুজাহিদ এক বছর বা তার অধিক সময় বাইরে থাকতে পারে। এই প্রতিবন্ধকতার সমাধান হল **সবর।**

অতঃপর তা আল্লাহ্ সূরা আত-তাওবার এই আয়াতের ধারাবাহিকতায় নাযিল করলেন , **''...যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর রাসত্মায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর আদেশের এবং আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের পথ দেখান না''** এখানে আল্লাহর আদেশ বলতে তার শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

যখন কেউ এই ৮টিপ্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে জয়ী হয়

সে এক বিশাল বিজয় লাভ করে এবং সেই সাথে আরেকটি বিজয়ঃ **ফাসিক হওয়া থেকে বেঁচে যায়।** যেমন আল্লাহ বলেছেন যে, যারা এই সব প্রতিবন্ধকতাকে পরাস্ত না করবে, তারা ফাসিকুন। তুমি এই বিজয় অর্জন করতে পারবে, যখন তুমি প্রমাণ করবে যে, **তুমি শুধু মৌখিকভাবে নয় বাস্তবক্ষেত্রেও আল্লাহকে, তাঁর রসূল ﷺ-কে এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহকে ভালবাস।**

অনেক ইসলামিক জামা'আ দাবী করবে যে, তারা তোমাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে কিভাবে ভালবাসতে হয় দেখাবে। *তারা নাশীদ গাবে, কুরআন তিলওয়াত করবে, কুরআন নিয়ে আলোচনা করবে, সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করবে এবং এভাবে আরও অনেক কিছু করবে।* কিন্তু তুমি যদি সত্যি সেই ভালবাসা দেখাতে চাও, **তবে বেড়িয়ে পড় এবং মুজাহিদ হও।** তখন তোমার আর অধিক কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ তুমি তা কাজে দেখিয়েছ। ঈমানকে কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে।

বিজয়ের দ্বিতীয় অর্থঃ শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়

যদি কোন মুসলিম জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে সে শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ ''শয়তান তোমাকে ঈমানের পথে বিরত রাখতে চেষ্টা করে এবং তোমাকে বলে, 'তুমি কি তোমার ধর্ম এবং তোমার পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছ?' কিন্তু এই বান্দা তাকে অগ্রাহ্য করে। অতঃপর শয়তান তাকে হিজরতের পথে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। শয়তান তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি তোমার পরিবার ও সম্পদ ত্যাগ করতে যাচ্ছ?' কিন্তু এই বান্দা তাকে অগ্রাহ্য করে।

অতঃপর শয়তান তাকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ পথ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে, শয়তান তাকে বলে, **‘তুমি কি যুদ্ধ করতে এবং নিহত হতে যাচ্ছ? তোমার স্ত্রী অন্য কাউকে বিবাহ করবে এবং তোমার সম্পদ বিভক্ত করা হবে?’** কিন্তু সে তাকে অগ্রাহ্য করে এবং জিহাদ করে।’ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ‘এই বান্দার জন্য আল্লাহর ওয়াদা যে, তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন’।’’ (আহমেদ)

বিজয়ের তৃতীয় অর্থঃ মুজাহিদরা সুপথপ্রাপ্ত

আল্লাহর বাণী অনুযায়ী মুজাহিদগণ তাদের অন্তর্ভূক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ **‘‘যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।’’** (সূরা আনকাবুতঃ ৬৯)

এটা কি বিজয়ের একটি রূপ নয় যে তুমি পথপ্রাপ্ত হয়েছো?
আমরা সবাই কি সঠিক পথের অনুসন্ধানে লিপ্ত নই?

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের বলেন যে, যদি তোমরা মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত হও, তবে তুমি আল্লাহ্ কর্তৃক পথপ্রাপ্ত হবে। একইভাবে, **যদি পুরো উম্মাহ জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহেতে অংশগ্রহণ করে তবে পুরো উম্মাহ পথ প্রাপ্ত হবে। যে কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি তা হল এই যে আমরা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ ত্যাগ করেছি।** কিন্তু যে মূহুর্তে উম্মাহ আগ্রহী হবে, তার দায়িত্ব পালনে দন্ডায়মান হবে এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহতে অংশগ্রহণ করবে, আল্লাহ্ উম্মাহকে পথ প্রদর্শন করবেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ ‘‘আমি আল্লাহর রসূলকে ﷺ বলতে শুনেছি, ‘‘যখন তোমরা (আর্থিক) লেনদেনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ষাড়ের লেজ ধরে থাকবে, কৃষিকাজ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে পড়বে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর অসম্মানকে প্রবল করে দিবেন এবং তোমরা তোমাদের দ্বীনে (সত্যিকার ইসলাম) ফিরে না আসা পর্যন্ত তা তুলে নিবেন না”। (সুনান আবু দাউদ) একইভাবে, আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ যখনই **কোন ফাতোয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত** হয়ে পড়তেন, তারা এটা কোন প্রথম সারির মুজাহিদীনের

কাছে পাঠিয়ে দিতেন, কারণ তাঁরা জানতেন মুজাহিদীনরা আল্লাহ্ কর্তৃক পথপ্রাপ্ত।

বিজয়ের চতুর্থ অর্থঃ নিরুৎসাহিতকারীদেরবিরুদ্ধে বিজয়

যখন তুমি ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়, তুমি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী যারা তোমাকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করত। তারা তোমার মতই কথা বলে এবং নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবী করে **কিন্তু মুজাহিদ হওয়ারপ্রমাণ সমূহ বিকৃত করে** আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ **‘‘তারা তোমাদের সাথে বাহির হলে তোমাদের বিভ্রন্তিই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদেরমধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত। তোমাদের মধ্যে তাদের জন্যকথা শুনবার লোক আছে। আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত’’** (সূরা আত-তওবাঃ ৪৭)

এসব মানুষ আমাদের সামনে শাইখের বেশে আসতে পারে এবং তোমাদের বলতে পারে যে, এখন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর সময় নয় এবং তারা আলিম হওয়ার কারণে আপনি তাদের কথা শুনতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ **‘‘তোমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি থাকতে পারে যারা তাদের কথা শুনবে’’**

কেন তারা এসব লোকের কথা শোনে? কারণ তাদের **পদমর্যাদা।** তারা তাদের গোষ্ঠীর নেতা, এমনকি আলিমও। তারা মুসলিমদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ পালনে নিরুৎসাহিত করে। আর যেই একজন মুসলিমকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পালনে নিরুৎসাহিত করে, **সে একজন মুনাফিক,** কারণ এই আয়াত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে।

একজন মুসলিম যখন মুজাহিদ হয়, সে এসব লোকদের অগ্রাহ্য করে।
সে এসব লোকদের রাজত্বকে পরোয়া করেনা। একজন মুজাহিদ তাই করে যা আল্লাহ্ তাকে করতে বলেন। **এটা বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড়ফিৎনা,** যা আমরা দেখি বিশেষত আমাদের ছোট ভাইদের মধ্যে। আলিমরা তাদের উৎসাহিত করার বদলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে তাদের **নিরুৎসাহিত** করে। তাদের ইসলামিক জামা’আত প্রস্তুত গ্রহণ করার বদলে তাদেরকে পিছনে ধরে রাখে। এই আয়াত সাহাবীদের বলেছে যে তোমাদের কেউ কেউ হয়তো তাদের কথা শুনত, সাহাবাদের ঈমানের কোন কমতি ছিল না। কিন্তু তাঁরা এমন লোকের কথা শুধুমাত্র উচ্চ মর্যাদার কারণে শুনে থাকত। কিন্তু আল্লাহ্ মুসলিম সেনাদলের সাথে মুনাফিকদের যাওয়া বন্ধ করে, এসব সাহাবীদের রক্ষা করলেন। যদি তারা যেত, তারা বরং মতনৈক্য বা ফিৎনার বিস্তার করত। এই ফিৎনার

ভয়াবহতা এতই বেশি যে, আল্লাহ্ এমন লোকদের ব্যাপারে সাহাবাদের সর্তক করেছেন। আল্লাহ্ মহামহিম বলেনঃ **‘‘যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দবোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম, যদি তারা বুঝত!’’** (সূরা আত-তওবাঃ ৮১)

মুজাহিদগণ নিজেদের নফসকে, শয়তানকে এবং যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে তাদের পরাস্ত করে। এটা একটি বড় বিজয়। আবার মুজাহিদীনদের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা তাদের সমাজিক মর্যাদার জন্য। যখন তারা মানুষকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে, মানুষ তখন যুদ্ধ হতে বিরত থাকে। আমাদের অধিকাংশ তরুণ আল্লাহ কে সঠিক উপায়ে সন্তুষ্ট করতে চায় কিন্তু এসব শাইখ এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বের কারণে পারেনা, তারা এসব তরুণদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ হতে পিছন থেকে ধরে রাখে।

দেখুন, এসব মর্যাদা সম্পন্ন লোকেরা কত গুণাহ জমা করেছে। তারা যা করছে তা কুফফারদের সেবা করারই নামান্তর। তাদের দাওয়াহ কুফফারদের সেবা দেয়, **তারা এর জন্য অর্থ প্রাপ্ত হোক অথবা না হোক।** তাদের সাথে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির (গোয়েন্দা বিভাগ) যোগাযোগ **থাক অথবা না থাক,** এতে কোন পার্থক্য নেই। যদি তোমার কাজ কুফফারদের সেবা দেয় বা উপকারে আসে, তখন তুমি তাদেরই একজন।

বিজয়ের পঞ্চম অর্থঃ জিহাদের পথে দৃঢ়পদ থাকা

যখন কোন মুজাহিদ দৃঢ়পদ থাকে এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথ অনুসরণ করে এবং সব বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, সে বিজয় অর্জন করে। যদি সে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উপর স্থির থাকতে সমর্থ হয়, সে সফলকাম।

- ✓ জিহাদ বর্তমান যুগে মুসলিমদের জন্য বিরল একটি বিষয়।
  কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময় এ চিত্র ছিল না। মানুষ তোমাকে বেড়িয়ে পড়তে উৎসাহ দিত। এমন অনেক কাহিনী আছে, যেখানে পিতারা পরিবারের প্রতি পুত্রদের ফী সাবিলিল্লাহ

বেড়িয়ে পড়ার পক্ষে যুক্তি প্রদান করত। তুমি ভাবতে পার বর্তমান অবস্থা কত আলাদা? বর্তমানে অনেক লোক তোমার বিপক্ষে যাবে, তোমার পিতা-মাতা , তোমার বন্ধু-বান্ধব , তোমার সমাজ, তোমার এলাকার মসজিদ, তোমার সরকার এবং আরও অনেকে, যখন কেউ এই 'ইবাদত' বছরের পর বছর চালিয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে সবর করবে, সে বৃহৎ বিজয় অর্জন করবে। আমরা একদিন অথবা একমাসের কথা বলছিনা, যখন তোমার আবেগ বেশি থাকবে তখন করবে, আবার যখন আবেগ কমে যাবে তখন তা ছেড়ে দিবে, এমনটি নয়। আসল পরীক্ষা হল এই পথকে বেছে নেয়া এবং এর উপর **দৃঢ়পদ** থাকা।

এরকম অনেক মুসলিম আছে যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ হতে ফিরে আসে, তাদের চিন্তা, আদর্শ বদলে যায় এবং জিহাদের চিন্তা তাদের মাথা থেকে বেড়িয়ে যায়। তাদের অধিকাংশই তাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা দামী গাড়ি ও বড় অট্টালিকা আঁকড়ে ধরে থাকে। যেসব মুসলিম সরকার তাদের ভয় করে, তারা তাদেরকে একটি চাকরী, স্ত্রী, বাসস্থান ইত্যাদি উপহার দিতে চেষ্টা করে, যাতে করে এসব পুরোন মুজাহিদগণ জিহাদের ধারে কাছে আসতে না পারে।

যখন রসূল ﷺ প্রথম দাওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন তা ছিল গোপন, তখন কেউ সত্যিকার অর্থে এটাকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু যখন তিনি তাঁর দাওয়াহ প্রকাশ করলেন, তখনই শত্রুরা আত্মপ্রকাশ করল- ইসলাম তাদেরকে নিজ নিজ ইচ্ছার এবং মিথ্যা মাবুদের দাসত্ব করা পরিত্যাগ করতে বলল। এটা তাদের নির্ধারিত মর্যাদা বদলে দিল। একদল লোক ছিল যারা তাদের নির্ধারিত মর্যাদার মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করত এবং এর ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এটিই বাস্তবতা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদের নিজ নিজ নির্ধারিত মর্যাদার সুবিধা ভোগ করে থাকে। সুতরাং যখন তারা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণীকে হুমকিস্বরূপ দেখল, তারা তাঁর কাছে আসল এবং তাঁকে কিছু প্রস্তাব করল। তারা তাঁর কাছে **ক্ষমতা, সম্পদ** এবং **নারীর** প্রস্তাব করল। এসবই সেসব বিষয় যা বেশির ভাগ পুরুষ আকাঙ্খা করে।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এই প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন। মূল বিষয় হল, যে কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করতে চায়, তাকে সে সবের অধিকাংশ বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে, যার সম্মুখীন রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে হয়েছিলেন। তুমি যখন এই পথের উপর থাকবে, তখন তাদের সেসব প্রস্তাবও তোমার কাছে আসবে। তারা তোমাকে জেলে দিতে চাবে অথবা তোমার পথকে রূদ্ধ করতে চাবে। কিছু মানুষ ছিল যারা দুনিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল আবার কিছু মানুষ ছিল যারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছিল কিন্তু মুজাহিদীনগণ কখনও তাঁদের

আদর্শকে পরিত্যাগ করেনি।

বিজয়ের ষষ্ঠ অর্থঃ সম্পদ এবং সত্তার কোরবানী

তুমি যদি এই পথের উপর অবস্থান কর, তবে তুমি বিজয় লাভ করেছ, কারণ তুমি তোমার জান, মাল, সময় আল্লাহর কারণে কোরবানী করতে আগ্রহী। এই দ্বীনের জন্য কোনবানীই হল বিজয়।

যখন তুমি তোমার সম্পদ, অস্ত্র-সস্ত্র এবং সংখ্যার দিক থেকে দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের বিরুদ্ধে দাড়াচ্ছ, যদিওবা বাহ্যিকভাবে তারা তোমার থেকে এ সব ক্ষেত্রে বহু গুণ শক্তিশালি আর তাদের বাহিনী দেখে মনে হচ্ছে পরাজয় প্রায় অবশ্যম্ভবী। তোমার এই দাড়ানোই হচ্ছে বিজয়ের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন। এটা এমন বিষয় যা দেখে সহজে একজন মানুষ প্রভাবিত করে। এটাই তাদের সাহস এবং দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ, যে কারণে তারা কোরবানী করতে প্রস্তুত। আমরা আজকে সেই নমুনা ইরাকে দেখি, মুসলিমদের একটি ক্ষুদ্র অংশ আল্লাহর উদ্দেশ্যে উঠে দাড়িয়ে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছে, এমন এক ফৌজের বিরুদ্ধে যারা প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-সস্ত্র , সংখ্যা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অধিকতর উন্নত। **এটা হল নৈতিক বিজয়।** ইতিহাস তাদের কথা মনে রাখে না, যারা মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল।

মুসলিমদের অভ্যন্তরীন দলসমূহ যাদেরকে পরাজিত করেছ, তারা হল সেসব লোক যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ কে ঘৃণা করে। একমাত্র সবরই মুজাহিদদের এ পথে চলার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। মুজাহিদীনরা যে দো'আ করে কোরআনের ভাষায় তা হল, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন বলতে লাগল, **''তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য্য দান কর, আমাদের পা অবিচল রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।''** (সূরা আল-বাকারাঃ ২৫০)

> খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফফার কর্তৃক আটককৃত হয়ে মক্কায় আসেন। তারা তাঁকে শূলীবিদ্ধ করে। যখন তাঁকে শূলে চড়ানোর জন্য নেয়া হয় এবং শত্রুরা তাঁর দিকে তাদের অস্ত্রসমূহ তাক করে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ''তুমি কি তোমার বদলে মুহাম্মদকে তোমার অবস্থায় পছন্দ করবে?'' খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ *''মুহাম্মদ ﷺ এর পায়ে একটি কাঁটা ফোটার বদলে আমি বরং মরতে পছন্দ করব এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে মৃত্যু নয়, একটা কাঁটার আঘাত থেকে বাঁচাতে আমি আমার জীবন ত্যাগ করা এবং*

মৃত্যু বরণ করা পছন্দ করি।'' **-এটাই হচ্ছে বিজয়।**

এটা প্রতীয়মাণ করে সাহাবাদের ঈমান কত মজবুত ছিল, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি তাদের কত ভালবাসা ছিল। মুজাহিদীনগণ বলে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং তাঁদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা প্রস্তুত। আজ যারা মুজাহিদীন নয়, তারা দাবী করে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসে, যদিও তারা ঘুরে বেড়ায়, নাচ-গান করে , শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আরাম করে বসে থাকে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন করে।
এরা সবচেয়ে নির্বোধ।

তুমি কিভাবে বলতে সাহস কর যে, তুমি আল্লাহর দ্বীনকে ভালবাস এবং তুমি জানো যে, আল্লাহর কিতাবের অবমাননা করা হচ্ছে এবং তুমি কিছুই করছ না? যখন তুমি জানো যে, তারা **কুরআনকে টয়লেটে নিক্ষেপ করছে** এবং তুমি তোমার অস্ত্র তুলে ধরছ না এবং আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করছ না? যখন তুমি জানো যে, তারা **রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অসম্মানিত করেছে তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে** যখন তুমি জানো যে, তারা মুসলিম যুদ্ধ বন্দীদের **শারিরীক ও মানসিকভাবে নির্যাতন** করছে? যখন তুমি জানো যে, তারা মুসলিম যুদ্ধ বন্দীদের **বিবস্ত্র** করে এবং তাদের বাজে ছবি তুলে, উম্মাহকে বিব্রত এবং অবমাননা করছে?

যখন তুমি জানো যে. সত্য ইসলামের উপর তারা **বিকৃত ইসলামিক অধ্যায়ের প্রবর্তন** করছে? যখন তুমি জানো যে, ইরাক, ফিলিস্তিনে, আফগানিস্তানে তারা নিরপরাধ বেসামরিক মুসলিমদের হত্যা করছে? যখন তুমি জানো যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মুজাহিদীনদের সাথে যুদ্ধ করছে?
যখন তুমি জানো যে, তারা মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন চালিয়েছে? যখন তুমি জানো যে, তারা কুরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠা টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করছে? যখন তুমি জানো যে তাদের সেনাবাহিনীর প্রধান **পরিষ্কার এবং প্রকাশ্যভাবে** আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ﷺ বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছে?

তুমি কিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসার দাবী কর, যখন তুমি জানো এসব অন্যায় হচ্ছে এবং তুমি

কিছুই করছ না? তোমার জন্য কি তোমার বাড়িতে বোমা পড়তে হবে, যাতে তুমি উঠে দাড়িয়ে যুদ্ধ করবে? তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। মানসিকভাবে হতাশ হয়ে কিছু করা যাবে না। তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস দাবী করার সাথে সাথে, এই বিশ্বাসের বলে সবকিছু করতে পারবে।

সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আদেশের অধীনে অনেক তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে কি এ ক্ষেত্রে বলতে পারবে যে, মহানবী ﷺ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং তিনি হিকমাহ অবলম্বন করেননি? কোন সুস্থ এবং অনুশীলনরত মুসলিম কি এমন বলার সাহস করতে পারে? কি বলার আছে, আজ যখন একটি কাফির আল্লাহ্ এবং আমাদের রসূল ﷺ-কে অপমান করে আর আমরা বলি যে, *তাদের সাথে আমাদের শান্তিপূর্ণ আলোচনা করা উচিত?*

আমরা ইসলামের সঠিকপথ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি এবং এই সত্যপথকে কিভাবে আমাদের অসাড় যুক্তি দিয়ে পরিবর্তন করছি? কিছু মুসলিম বিতর্ক করে যে, এরকম হত্যা অভিযান চালানোর জন্য খলিফার প্রয়োজন। এই ওজর একেবারেই ভিত্তিহীন এবং আমাদের ভীরুতার পরিচায়ক।

ঠিক এসময় আমরা সেইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যা আমাদের কাছে মিথ্যা হতে সত্যকে পৃথক করে দেখাচ্ছে। এর পূর্বে সবকিছু ধোঁয়াটে ছিল এবং তুমি জানতে না, **কে সত্য মু'মিন এবং কে মুনাফিক।** কিন্তু এরকম ঘটনাসমূহ সত্য ঈমানকে নিফাকের মধ্য হতে প্রকাশ করে। আমরা আরও জানি যে, **নিফাকের ঘটনা মদীনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং তা কখনই মক্কায় ছিল না। কেন? কারণ মদীনায় জিহাদ ছিল।** আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ **"তারা কি দেখে না যে তাদেরকে প্রতি বৎসর একবার বা দুবার বিপর্যস্ত করা হয়? তারপরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।"** (সূরা আত-তওবাঃ ১২৬)

এই আয়াত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে বলছেন যে, প্রতি বছর তাদের সামনে একটি বা দু'টি ঘটনার অবতারণা হয়। **এই ঘটনাগুলো কি?** রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে **ঈমান এবং নিফাক প্রকাশিত** হয়ে পড়ে।

সহীহ আল-বুখারী-তে *উখদুদ (গর্তের) বাসীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে বিজয় কাকে বলে এই কাহিনী তার বিশাল উত্তর।*

তারা একটি জাতি বা দল ছিল যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সে সময়কার রাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। রাজা তাদের বলেছিল যে, **হয় ধর্ম ত্যাগ কর এবং বেঁচে থাক অথবা নিজ ধর্মে থাক এবং মৃত্যু বরণ কর।** তারা মৃত্যুকে বেছে নিল। তাদের মৃত্যুর পদ্ধতি এত ভয়াবহ ছিল যে, তারা যা করেছিল আমাদের অবশ্যই তার প্রশংসা করা উচিত। তাদেরকে বলা হয়েছিল তারা যেন জ্বলন্ত কাঠ দ্বারা পূর্ণ গর্তসমূহে জীবন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা একের পর এক ঝাঁপ দেয় এবং আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করে। তারা এই পৃথিবীর আগুনকে পরকালের আগুনের বিনিময়ে বেছে নিয়েছিল। সেখানে সদ্যজাত একটি শিশুসন্তানসহ মা উপস্থিত ছিলেন, যাদেরকে আগুনে ঝাপ দিতে বলা হয়েছিল। যখন সেই মা গর্তের খুব কাছে চলে আসে, সে ইতঃস্তত বোধ করে, তখন আল্লাহ্ এই সদ্যজাত শিশু সন্তানের মুখে কথা ফুটিয়ে দেন এবং সে বলতে থাকে। **''হে মা! তুমি তো সৎ পথেরই অনুসরণ করছ সুতরাং দৃঢ় থাক।''** এরপর সে আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে।

এই মহিলা প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল আর তা হল গর্তের কাছে যাওয়া। কিন্তু যখন সে ইতস্তত করল, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করলেন। এভাবে তুমি যদি আল্লাহর পথে একটি পদক্ষেপ দাও, আল্লাহ্ তোমার দিকে অনেক পদক্ষেপ দিবেন। তুমি যদি আল্লাহর দিকে চলতে শুরু কর, তিনি তোমার দিকে দৌড়ে আসবেন। **এ কাহিনীর সারমর্ম হল** প্রথমে পদক্ষেপ নেয়া এবং তুমি যদি এই পথে দূর্বল হয়ে পড়, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন, যদি তুমি ইখলাসের সাথে শুরু করে থাক।

সুতরাং, আল্লাহ্ এই শিশুকে কথা বলানের মাধ্যমে মহিলাকে কিরামাহ দেখালেন, শুধুমাত্র তাদের রক্ষা করার জন্য। পার্থিব ও নিরপক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সবাই পরাজিত হয়েছিল (!)। তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল এবং রাজা তাদের দ্বীনকে নির্মূল করতে সফল হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ **''এটাই বড়**

বিজয়।'' (সূরা আল-বুরূজঃ ১১)

বিজয়ের সপ্তম অর্থঃ তোমার আদর্শের বিজয়

তোমার আদর্শের বিজয় হচ্ছে বিজয়ের সপ্তম অর্থ। আদর্শের সমারোহে তোমার আদর্শই সর্বোৎকৃষ্ট। তোমার আদর্শ এবং মূলনীতি জয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। কখনও এটা সত্যিকার অর্থে জয়ী হয়, যখন তুমি তোমার রক্ত দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ কর। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যুক্তির মাধ্যমে তার নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে তাঁর এই আদর্শে জয়ী হয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ **''তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই যে ইব্রাহীমের সাথে তাঁর রব সম্বন্ধে বিতর্কেলিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, তিনি আমার রব যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বলল, আমিও তো জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও। অতঃপর যে কুফরী করেছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না''** (সূরা আল-বাকারাঃ ২৫৮)

***সূরা বুরুজে** ছেলেটির কাহিনী যা গর্তের ঘটনার জন্ম দেয় তা হচ্ছে,*

রাজাটি ছেলেটিকে হত্যা করতে চেয়েছিল। রাজার লোকেরা তাকে পর্বত হতে নিক্ষেপ্ত করে এবং সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চায়। কিন্তু প্রত্যেকবার রাজা ব্যর্থ হয়। ছোট ছেলেটি তখন রাজার কাছে এল এবং বলল, *''যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও, তবে আমার একটি তীর নাও এবং বল বিসমিল্লাহ; অতঃপর আমাকে আঘাত কর, তাহলে তুমি আমাকে মারতে পারবে। কিন্তু তোমাকে তা করতে হবে আল্লাহর নামে।''* ছোট ছেলেটি আরেকটি শর্ত জুড়ে দিল যে, রাজাকে তা প্রত্যেকের সামনে করতে হবে। যখন প্রত্যেকে দেখল যে, রাজা এ তরুণকে আল্লাহর নামে হত্যা করতে সমর্থ হল, **তখন কি ঘটল?**

তখন তারা সবাই মুসলিম হয়ে গেল এবং এটা ঠিক তাই, যা ছোট ছেলেটি চেয়েছিল এবং ঠিক তা, যা রাজা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। রাজা এই তরুণকে নির্মূল করতে চেয়েছিল তার বিশ্বাসের কারণে এবং এই কারণে

প্রত্যেকে মুসলিম হয়ে গেল। সে এই তরুণের '**দাওয়া**'-কে ভয় পেয়েছিল এবং এখন তার এই দাওয়া পুরো রাজত্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে তরুণটি দাওয়ার জন্য মূল্য পরিশোধ করেছে এবং এ মূল্য ছিল তার নিজের রক্ত। আমরা আমাদের সমসাময়িককালে **সাইদ কুতুবের**رحمهالله মত মানুষদের দেখি। তিনি কালি এবং নিজ রক্ত দিয়ে লিখেছেন। **শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম**رحمهالله এবং **শায়খ ইউসুফ আল ইউআইরী**رحمهالله । তারা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বই লিখেছেন এবং তাঁদের মৃত্যুর পর এসব বইকে জীবন্ত করতে আল্লাহ্ যেন তাঁদের আত্মাকে এসব বইয়ের শব্দে প্রবেশ করিছেন। এই ত্যাগ তাঁদের এই শব্দগুলোকে নতুন জীবন দিয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ''একটি তাইফাহ্ সব সময়ে বিজয়ী থাকবে।'' এখানে বিজয়ী থাকার অর্থ এই নয় যে তারা সব সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয় লাভ করতে থাকবে; বরং বিজয়ী থাকা অর্থ হচ্ছে তাদের দাওয়াহ্ সব সময়ে চালু থাকবে। তারা যুদ্ধে হেরে যেতে পারে কিন্তু তাদের দাওয়াহ্ বিজয় লাভ করবে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পরবে। কেউই তাদের দাওয়াহ্-কে বন্ধ করতে পারবেনা । এটি হচ্ছে সেই আদর্শ যার মাধ্যমে এই দলকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শক্তিশালী রাখবে।

বিজয়ের অষ্টম অর্থঃ কিরামাহর মাধ্যমে শত্রুকে ধ্বংস করা

আল্লাহ্ মুজাহিদীনদের শত্রুদের অলৌকিক উপায়ে বা ঘটনার মাধ্যমে ধ্বংস করবেন। এটা এ কারণে যে মুজাহিদীনরা তাদের সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছে। *মুজাহিদীন এবং শত্রুদের শক্তির ব্যাপক ব্যবধানের কারণে আল্লাহ্ তাদের অলৌকিক উপায়ে সাহায্য করবেন।* এই ধরনের ঘটনা ঘটে যখন মুজাহিদীনরা তাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের জন্য চেষ্টা চালায়। যেহেতু তারা আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। আল্লাহ বলেনঃ ''অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল , তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। **সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করলতখন তারা বলল, জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।**'' (সূরা আল বাকারাঃ ২৪৯)

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল অনেক বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে কিন্তু তাদের সবর থাকতে হবে। মু'সা আলাইহিস সালাম এবং ফিরআউনের মধ্যকার সংঘর্ষের প্রতি দৃষ্টি দাও। মুসা আলাইহিস সালাম এর পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল করেছেন, তারপর আল্লাহ্ অলৌকিকভাবে ফিরআউনকে ধ্বংস করলেন।
যখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য যুদ্ধ করলেন এবং তাদের সত্য পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান দেখলেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে দো'আ করলেন, **যেন আল্লাহ্ তাদেরকে দূর্ভিক্ষ এবং অনাহারে সাত বছর রাখে**যেমনটি রেখেছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম -এর লোকদেরকে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, *''তারা এক দূর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হল যা তাদের এত অভূক্ত রেখেছিল যে শেষে তারা সবকিছু খেতে শুরু করল যেমন- মৃত জীব, চামড়া এবং এরূপ সবকিছু যা তারা হাতের কাছে পেত।''*

যখনই আকাশের দিকে ফিরে তাকাত তারা ধোঁয়া দেখতে পেত, ক্ষুধার তাড়নায় তারা এমনই ঘোরাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আবু সুফিয়ান মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট এলেন এবং বললেন, *''হে মুহাম্মদ ﷺ, তুমি মানুষকে ভাল কাজ করতে বল এবং তুমি তাদেরকে পরিবারের প্রতি দয়ালু হতে বল, সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে আমাদেরকে রক্ষা করতে দো'আ কর।''*

এখন সে মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে ভিক্ষা চাচ্ছেন যাতে তিনি তাদের জন্য দো'আ করে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ (فَارْتَقِبْيَوْمَتَأْتِيالسَّمَاءُبِدُخَانٍمُبِينٍ)

''অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে'' (সূরা আদ-দুখানঃ ১০)

এইসব লোকরা ঘোরাচ্ছন্ন ছিল কারণ, কেউ যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকে তার অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাদের শ্রবণশক্তি দূর্বল হয় এবং দৃষ্টিশক্তিও দূর্বল হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিণতি সমসাময়িককালের একটি মজবুত প্রমাণ। মুজাহিদীনরা সংখ্যায় কম ছিল, শক্তি, অস্ত্র-সস্ত্র এবং ক্ষমতার দিক দিয়েও সোভিয়েতের তুলনায় দূর্বল ছিল। কিন্তু যেহেতু সোভিয়েতরা আল্লাহর শত্রু ছিল, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদের শত্রু ছিল, আল্লাহ্ তাদেরকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিলেন। যেমন- দারিদ্রতা , ধ্বংস, দূনীর্তি এবং অন্যান্য শাস্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে না গেল। জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের কারণে এটা আলাদা হয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাদের সহায়তা

করেছেন। কিছু লোক যুক্তি দেখায় যে, *সমাজতান্ত্রিক হওয়ার কারণে সোভিয়েত ধসে পড়েছিল।* **এই যুক্তির মূল সমস্যা হল, আরও অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল যারা ভেঙ্গে যায় নি।** কেউ যুক্তি দেখাবে যে, এটা তাদের **ঋণের জন্য** হয়েছে, হতে পারে। কিন্তু আমেরিকা সে সময় **অধিক ঋণগ্রস্ত** ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ধসে পড়ার ব্যাখ্যা শুধু একটাই হতে পারে- **মুজাহিদীন ফী সাবিলিল্লাহ্।**

আমরা আজ বলতে পারি যে, কোন জাতি যত শক্তিশালীই হোক না কেন, যদি তারা আল্লাহর আউলিয়ার (বন্ধু) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনস্থ করে, তবে তারা তাদের সমাপ্তির ব্যাপারে আস্বস্ত হতে পারে। হতে পারে তাদের এই সমাপ্তি মুজাহিদীনের হাতে অথবা মুজাহিদীনদের বিপক্ষে যুদ্ধের পরিণামে আসতে পারে। কারণ একটি হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ *''যে কেউ আমার আউলিয়ার বিরুদ্ধে দাড়ায়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।''*

বিজয়ের নবম অর্থঃ কাফিরদের জন্য দরিদ্রতা

বিজয়ের আরেকটি রূপ হল, কাফিরদের জন্য **কুফরের উপর অধিষ্ঠিত মৃত্যু এবং দরিদ্রতা।** তার একটি কারণ হচ্ছে জিহাদ। এটা তাদের সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। এটা বিজয়ের একটি রূপ। আল্লাহ্ ও তাঁর মুজাহিদীনের বিপক্ষে যুদ্ধ করার মাধ্যমে কুফফাররা তাদের কুফরীতে দৃঢ় হয় এবং গভীরভাবে কুফরীতে লিপ্ত হয়, যতক্ষণ না তারা কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। যখন তারা দেখে মুজাহিদীনরা যুদ্ধ করছে এবং জয়লাভ করছে, তারা হিংস্র হয়ে ওঠে এবং এটা তাদের যুদ্ধ করার এবং **কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ স্পৃহাকে মজবুত করে।** আল্লাহ তায়ালা সুরা ইউনুস-এ বলেন , মুসা আলাইহি সালাম আরয করলেন, **''মুসা বলল, হে আমাদের রব! তুমি তো ফিরআওন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছো।''** (সূরা ইউনূসঃ ৮৮)

এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, আল্লাহর নৈকট্যের ক্ষেত্রে সম্পদ কোন চিহ্ন নয়। অনেক *আম্বিয়া ছিল যারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল এবং অনেক কুফফার আছে যারা মাত্রাতিরিক্ত ধনী।*

দুর্ভাগ্যবশত, কে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী, তা মুসলিমরা সম্পদশালী হওয়ার উপর ভিত্তি করে নিরূপন করে। কিন্তু এটা বলা উচিত নয় যে, *''আল-হামদুলিল্লাহ্ ! আল্লাহ্ আমাকে এসব সম্পদ দিয়েছেন, এটা একটি নিদর্শন যে আমি ভাল মুসলিম।''* অনুরূপ কোন ব্যক্তি দরিদ্র এবং বলে *''আমি নিশ্চয়ই অনেক পাপ করেছি আর এজন্যই*

আমি দরিদ্র।'' তুমি কতখানি ভাল মুসলিম তার উপর সম্পদের কোন ভূমিকা নেই। সম্পদ এমন জিনিস যা তোমাকে কোন ভাল বা খারাপ দিকে পরিচালিত করবে, যা নির্ভর করে, তুমি কিভাবে তা ব্যবহার করছ তার উপর। মুসা আলাইহি সালাম বলেনঃ **''... হে আমাদের রব! যেই কারণ আপনার পথ হতে বিভ্রান্ত করে (মানবমন্ডলীকে)।''** (সূরা ইউনূসঃ ৮৮)

অন্যকথায়, তার এসব সম্পদ ও ক্ষমতা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ব্যবহার করে। সুতরাং তাঁর দু'আ ছিলঃ- **''হে আমাদের রব! তাদের সম্পদগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমুহকে কঠিন করে দিন, যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে দেখতে পারে।''** (সূরা ইউনূসঃ ৮৮)

মুসা আলাইহি সালাম তাদের পথপ্রাপ্তির জন্য দো'আ করছেন না। তিনি এ জন্য দো'আ করছেন যাতে তারা পথভ্রষ্ট হয়। মুসা আলাইহি সালাম বলছেন, **''হে আল্লাহ্! তাদেরকে বিশ্বাসীতে পরিণত করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব দেরী হয়ে যায়।''** মুসা আলাইহি সালাম ফিরাউনের কুফরের কারণে অত্যন্ত হতাশ ছিলেন। তিনি চাননি যে, ফিরআউন বিশ্বাস স্থাপনের কোন সুযোগ পাক। ফিরআউন শেষ পর্যন্ত ইসলাম দাবী করেছিল কিন্তু তা কবুল করা হয়নি, কারণ তার আত্মা তখন দেহ হতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ পুংখানুপুঙ্খরূপে মুসা আলাইহি সালাম এর দো'আ গ্রহণ করলেন। যখন ফিরাউন আল্লাহর শাস্তি অবলোকন করল তখন সে বলল, **'' ...আমি ঈমান আনলাম, যে মাবুদের উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই, আমিও (তাঁর) অনুগতদের একজন।'' (সূরা ইউনুস ৯০)** কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

জিব্রাইল আলাইহি সালাম মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, যখন ফিরাউন ডুবে যাচ্ছিল *''জিব্রাইল তার মুখে মাটি ছুড়ে মারছিল, যাতে আল্লাহ্ ফিরাউনের উপর কোনরূপ দয়া না করেন। জিব্রাইল আলাইহি সালাম পর্যন্ত চাননি ফিরাউন মুসলিম হোক। তিনি চেয়েছিলেন সে কাফির অবস্থায় মারা যাক, তিনি তাকে কোন ভাবে জান্নাতের যোগ্য মনে করেননি।''*

এটা একটি বিজয়। কারণ, মুসলিমরা শত্রুদের উপর আল্লাহর প্রদত্ত শাস্তি দেখে খুশি হয়। পরিশেষে, ঈমানদাররা তাদের মত হবে যারা **মুচকি হাসবে,** অন্যদিকে ফিরাউনের মত লোকরা **ভীষণ আযাবের** মধ্য দিয়ে যাবে। কাজেই, *কুফর, স্বেচ্ছাচারিতা, শয়তানী কর্মকান্ড এবং কুফফারদের দাবীসমূহ* যা তারা নিজেদের রক্ষা করতে ব্যবহার করে যেমন- *স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-* এসবই তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ

হয়ে যাবে, যা তাদের নিকট রয়েছে। তাদের জীবনের যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে, তা যা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে তা হতে কম। সেদিন অবশ্যই আসবে যখন ঈমানদাররা জান্নাতে অবস্থান করবে এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের তীব্র শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখবে। ইহুদীদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জিহাদ সমূহ তাদের কুফরের উপর মৃত্যু বরণ করা এবং শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত **কুফরের উপর জেদ করে অবস্থান করার কারণে।**

বিজয়ের দশম অর্থঃ আল্লাহ্ শাহাদাত দান করেন

আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে শুহাদা বেছে নিবেন। আল্লাহ্ রাহমানির রাহীম বলেনঃ **''যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমগণকে পছন্দ করেন না''** (সূরা আলে-ইমরানঃ ১৪০)

অন্যকথায়, আল্লাহ্ বেছে নেন আমাদের মধ্যে কারা আল-শহীদ হবে । **এটাই বিজয়।** শাহাদাহ এমন জিনিস যা প্রত্যেক মুজাহিদ আশা করে। যখন কুফফাররা তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় মরতে দেখবে তারা ভাববে, **এটা তাদের বিজয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে তুমিই জয়ী। কুফফাররা তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য বিনামূল্যে একটি প্রবেশপত্র দিয়েছে।** তাদের দুঃখের কথা ভাব, যখন তারা তোমাকে শেষ বিচারের দিন দেখবে, তারা বলবে, ***''আমাদের শত্রুদের দেখ! আমরা তাকে জান্নাতের চাবি দিয়েছি'***

রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন এবং **তিনবার বলেছেন ''আমি যদি ফী সাবিলিল্লাহ্ যুদ্ধ করতে পারতাম, অতঃপর নিহত হতাম এবং পুনরুত্থিত হতে পারতাম।''** তিনি তিনবার শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন। আল্লাহ্ মহামহিম বলেনঃ **''যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে কর না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত** (সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬৯)

যখন কুফফার তোমাকে হত্যা করে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাকে অনন্ত জীবন দান করে । মহান আল্লাহ্ বলেনঃ **''আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।''** (সূরা আল বাকারাঃ ১৫৪)

সহীহ্ বুখারী এবং মুসলিম-এ একটি কাহিনী উ ল্লেখ রয়েছে যা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবাকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বলতে বলেন, আনাস ইবনে মালিকের চাচা হারাম বিন মারহান রাদিয়াল্লাহু আনহু কথা বলছিলেন এবং **এমতাবস্থায় পশ্চাতে বর্শা বিদ্ধ হন, বর্শা তার বুক দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল।** তিনি তাঁর হাত রক্তে ভেজালেন এবং তাঁর রক্ত হাতে এবং মুখে মুছে নিলেন এবং বললেনঃ **''কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি''** যে লোকটি তাঁকে বর্শাবিদ্ধ করেছিল, জানত না এই ব্যক্তি কি বিষয়ে বলছে। সে এতই বিস্মিত হল যে, চতুর্দিকের মুসলিমদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে বেড়িয়ে পড়ল, যাতে তারা তাকে ব্যাখ্যা করে যে কি ঘটেছে। তারা তাকে বলল, **'এটা শাহাদাহ'**। তিনি জান্নাতে অবস্থান করছেন এবং তা উপভোগ করছেন। যখন এ জাতীয় ঘটনা অন্য কোন ব্যক্তির বেলায় ঘটে যে ইসলামের পরোয়া করেনা। তারা কাঁদতে শুরু করে, আর্তনাদ করতে থাকে এবং মানুষকে বলে যেন তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় ইত্যাদি। যে লোকটি তাঁকে হত্যা করেছিল সব ঘটনা শোনার পর সে মুসলিম হয়ে যায়।

সুবহানাল্লাহ্! হারাম বিন মারহান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ হত্যাকারীর মুসলিম হওয়ার কারণ হয়ে যান।

ফিদায়ী হামলার ক্ষেত্রে, যখন কোন মুসলিমের দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সাফল্যের সুযোগ রয়েছে, অথচ শহীদ হওয়ার জন্য সে খুঁজে ফেরে। এটা কাফিরদের তত্ত্ব (Theory) পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে এবং কাফেরদেরকে সত্যিকার কারণের প্রতি দৃষ্টি দানের জন্য বাধ্য করে যে, কি কারণে কতিপয় ব্যক্তি নিজ নিজ জীবন বিসর্জন দেয়।

বিজয়ের একাদশ অর্থঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয়

এই সেই বিজয় যা রসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষ পর্যন্ত অর্জন করেছিলেন। যখন তিনি মারা গেলেন, তিনি তাঁর চেষ্টার ফল দেখতে পেলেন এবং একই সাথে তার কর্তব্যের ফলাফল পেলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ **''যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তোমার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা প্রার্থনা করবে, তিনি তো তওবা কবুলকারী।''** (সূরা আন-নাস র)

এই আলোচিত **১১**টা রূপ ছাড়াও বিজয়ের আরও রূপ আছে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ

''... মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব'' (সূরা আর-রূমঃ ৪৭)

আমরা এখন বিজয়ের **১১**টি বিভিন্ন রূপের পরিচয় পেয়েছি, **আমরা পরিষ্কারভাবে দেখি যে মুজাহিদরা বিজয় অর্জন করেছে।** একইভাবে, যেসব নবীগণের কোন অনুসারী ছিলনা, তাঁরাও বিজয় লাভ করেছেন। একজন মুসলিম যে সর্বদা দৃঢ়পদ জয়লাভ করে এবং কখনও হেরে যায় না। প্রত্যেক মুসলিমেরই দৃঢ়তার প্রয়োজন রয়েছে।

নিশ্চয়ই, এই উম্মাহ পরিশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করবে এবং এই পুরো পৃথিবীর দায়িত্ব নিবে।
এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, **''এই ব্যাপার (ইসলাম) যেসব স্থানে রাত এবং দিন পৌছে সেসব স্থানে পৌছে যাবে।''** এর অর্থ **পুরো গ্রহ।** রাত ও দিন পুরো পৃথিবীতে পৌছে। তিনি আরও বলেন, **''ইসলাম প্রতি গৃহে, শহরে, জেলায় এবং গ্রামে পৌছাবে''** এই দু' হাদীস ইসলামের দাওয়াহকেও নির্দেশ করে। এটা সবখানে পৌছে যাবে। তিনি আরও বলেছেন, **''নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমাকে পুরো পৃথিবী দেখিয়েছেন এবং আমাকে বলেছেন যে আমার জাতির রাজত্ব এর পুরো অংশে পৌছে যাবে''** এ হাদীস ইসলামিক খেলাফতের দিকে নির্দেশ করে।

একদা রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়, ''কোন শহর আগে বিজয়লব্ধ হবে কন্সট্যান্টিনেপল না রোম?'' তিনি বলেন, ''প্রথমে কন্সট্যান্টিনেপল বিজয়লব্ধ হবে।'' এ হাদীস থেকে দেখা যায় যে, পর্যায়ক্রমে পরবর্তীটি বিজয়লব্ধ হবে। ইমাম আল-মাহদীর উপর একটি হাদীসে যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র এ বিষয় আরও অনেক হাদীস রয়েছে। তিনি পুরো পৃথিবী ৭ বছরে দখল করবেন।

পর্যায়ক্রমে উম্মাহ জয়ী হবে। এর সাথে সাথে, আমাদের এসব হাদীসের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না এবং এই কথা বললে চলবে না যে, *আল্লাহ্‌ই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন সুতরাং আমাদের জন্য কিছু না করাই যৌক্তিক।* না, বরং তোমার এতে একটি অংশ থাকতে হবে।

উম্মাহর বিজয় দিয়ে কি হবে যদি তুমি কিছু না কর ফলে তুমি কোন আযরই প্রাপ্ত হলে না?

আমাদের সকলকে ইসলামের এ বিজয় ফিরিয়ে আনতে যার যার ভূমিকায় কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রচুর আজর দেয়া হবে এবং আমাদের এতে অংশ নেয়া উচিত।

সারসংক্ষেপঃ চলুন বিজয়ের ১১টি প্রয়োগকে পুনঃআলোচনা করা যাক-

১. সূরা আত-তাওবা-তে যে ৮টি প্রতিবন্ধকতার কথা উলেস্নখ করা হয়েছে , তার উপর বিজয় লাভ করা।
২. শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়।
৩. মুজাহিদীনরা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে পথ প্রাপ্ত হন, কারণ তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করার প্রতিশ্রম্নতি দিয়েছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন, **''যারা আমার উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনা করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণদের সঙ্গে থাকেন''**
৪. নিরুৎসাহিতকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়। এরা হচ্ছে সেই সকল মুনাফিক্বীন যারা পরহেজগার মুসলিম অথবা আলিমের রূপে হয়ে থাকে কিংবা ঐ সকল ইসলামীক দল যারা জিহাদের ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করে থাকে।
৫. জিহাদের পথে দৃঢ়পদ থাকা।
৬. আক্বীদা রক্ষা করার জন্য নিজের সম্পদ এবং সত্ত্বার কোরবানী দেয়া।
৭. মুজাহিদীনদের আদর্শের বিজয়। এক্ষেত্রে আস-হাবুল উখদুদ-এর অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত।
৮. কিরামাহর মাধ্যমে শত্রুকে ধ্বংস করা। পূর্বের যুগের মধ্যে এর উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফিরাউন ও তার বাহিনীর ধ্বংস আর বর্তমান যুগের মধ্যে এর উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুজাহিদীনদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন।
৯. কাফিরদের জন্য কুফরের উপর অধিষ্ঠিত মৃত্যু এবং দরিদ্রতা, তার একটি কারণ হচ্ছে জিহাদ এবং মুজাহিদীন।
১০. আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের মধ্য থেকে শহীদদের বেছে নিবেন।
১১. যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করা।

জিহাদের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যঃ পরাজয়ের সংজ্ঞা

জিহাদের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যঃ পরাজয়ের সংজ্ঞা

পরাজয় বলতে কি বুঝায়? মানুষ কি নিহত হলেই পরাজয় হয়ে যায়? যদি না হয় তবে পরাজয় বলতে কি বুঝায়? এর সত্যতা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তা হলো সেই আদর্শগত দ্বন্দ্ব যা শারীরিক যুদ্ধের ফলাফলের ক্ষেত্রে ধরা হয়। অর্থাৎ যখন কোন কুস্তি বা শারীরিক যুদ্ধ হয় তখন জয় পরাজয়ের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় শারীরিক যুদ্ধের ফলাফল দেখে, কিন্তু যখন একটি আদর্শের সাথে আরেকটি আদর্শের যুদ্ধ হয় তখন কিন্তু এর বিষয়বস্তু হল আদর্শের সংঘর্ষ। আর সেক্ষেত্রে শারীরিক যুদ্ধের ফলাফলের সাথে আরও জড়িয়ে থাকে একজন ব্যক্তির আদর্শের জয় বা পরাজয়ের বিষয়টিও। কাজেই, কোন ব্যক্তি যদি তার **আদর্শ পরিত্যাগ** করে, সেটিই হল তাঁর **সামগ্রিক পরাজয়।**

৮ ধরনের পরাজয় রয়েছেঃ

পরাজয়ের প্রথম অর্থঃ কুফফারদের পথ অনুসরণ

প্রথম অর্থটি এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(وَلَنْتَرْضَىعَنْكَالْيَهُودُوَلَاالنَّصَارَىحَتَّىتَتَّبِعَمِلَّتَهُمْقُلْإِنَّهُدَىاللَّهِهُوَالْهُدَىوَلَئِنِاتَّبَعْتَأَهْوَاءَهُمْبَعْدَالَّذِيجَاءَكَمِنَالْعِلْمِمَالَكَمِنَاللَّهِمِنْوَلِيٍّوَلَانَصِيرٍ)

‘‘ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীনের অনুসরণ কর। বল আল্লাহর পথ নির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। (সূরা আল বাকারাঃ ১২০)

এখানে পরাজয় বলতে কি বোঝায়? **তাদের মত হয়ে যাওয়া**।
তুমি যদি ওদের একজন হয়ে যাও, তবে তুমি আল্লাহর বাণী অনুযায়ী একই রকম। অন্য আয়াতে যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ একজন জালিম হবে । এর সাথে সাথে তুমি আল্লাহর বিপক্ষে কোন সাহায্যকারী বা তার বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকারীও পাবে না।

যদি কোন একজন মুসলিম জীবনের অন্য পথ, অন্য আদর্শ অনুসরণ করে যেমন- **আধুনিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র** ইত্যাদি, এমনকি তা আংশিকভাবে হলেও সে ব্যর্থ। এমনকি, সেই জীবন পদ্ধতিতে সে যদি বিশাল মর্যাদা, সম্পদ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় তবুও, কারণ এটা হল **আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করা।**

যদি কোন মুসলিম , উদাহরণস্বরূপ, কোন অমুসলিম দেশে বিশাল ব্যবধানে **নির্বাচনে জয়লাভ** করে, সেটি হবে একধরনের **পরাজয় যা কোন বিজয় নয়।** এটা পরাজয় কারণ, সার্বিক ক্ষেত্রেই হোক বা ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক, সে তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। তার ক্ষমতায় যাওয়া কোন আলোচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য বিষয় হল আল্লাহর আইন এবং তাঁর দ্বীন ক্ষমতায় যাওয়া। তাদেরকে অনুসরণ করা বলতে সবসময় জনসম্মুখে তা দাবী করা বোঝায় না, কারণ এ ধরনের ঘটনা বিরল। এই আয়াতে জনসম্মুখে ঘোষণা করার কথা বলা হয়নি, বরং এখানে তাদের অনুসরণের ব্যাপারে আভাস দেয়া হয়েছে। যদি কারও কথা ও কাজ তাদের অনুসরণের অনুরূপ হয়ে থাকে, তবে সে তাদের অনুসরণ করছে।

এই আয়াতে ইহুদী এবং নাসারাদের কথা বলা হয়েছে, ***কিন্তু যদি ইহুদী এবং নাসারাগণ তাদের নিজ নিজ ধর্মকে অনুসরণ না করে*** সে ক্ষেত্রে কি হবে? এই আয়াতে বলা হয়েছে, **"যতক্ষণ না তুমি তাদের পথ অনুসরণ করছ"** , বলা হয়নি যে তাদের **ধর্ম** (আল্লাহ তা'আলা এখানে 'মিল্লাহ' অর্থাৎ 'পথ' বলেছেন; 'মাজহাব' বলেন নি) অনুসরণ করছ। যদি আজকে তাদের পথ হয়ে থাকে **পবিত্র গ্রন্থকে অবজ্ঞা** করা এবং নিজ নিজ **খেয়াল খুশি মত চলা** এবং **অধিকাংশের মত অনুযায়ী চলা** তবে এখানে এসব কথাই বলা হয়েছে।

যদি তারা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় নীতির বদলে মানব রচিত বিধান অনুসরণ করে, তবে এটাই তাদের পথ। এজন্য এটার প্রয়োজন নেই যে, তুমি তোমার গলায় ক্রুশ ঝুলাবে। পশ্চিমে তারা তাদের ধর্মে আমূল পরিবর্তন এনেছে। একই সাথে তাদের নেতারা ধর্মের প্রতি আন্তরিক নয়। তারা সত্যিকার অর্থে সম্পদ, ক্ষমতা এবং লোভের পিছনে ছুটছে। এ আয়াত তাদের পথকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্রের উন্নয়নে সাহায্য করার অর্থ **তাদের পথকে অনুসরণ** করা। ধর্মনিরপেক্ষতার উন্নয়নে সাহায্য করাও **তাদের পথকে অনুসরণ** করা বোঝায়।

কাফির হওয়ার জন্য এ কাজই যথেষ্ট; তা ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা ঈমানের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কি বলি? আমরা এ দ্বারা অন্তর, কথা এবং কাজে বিশ্বাস করাকে বুঝি। সুতরাং **ঈমানের একটি অংশ হল কৃত কাজ। কুফরের ক্ষেত্রেও একই।** এটা অন্তরের বিশ্বাস হতে পারে, মুখের কথা হতে পারে এবং হতে পারে কারও কৃতকর্ম। সুতরাং কোন মুসলিম নামধারীর কথা, বিশ্বাস অথবা কাজ যদি কুফফারদের মত হয়, তবে এই আয়াত তাদের ক্ষেত্রে বর্তাবে। আমরা যখন এই সংজ্ঞা ব্যবহার করি, তখন আমরা দেখতে পাই এর মাঝে কত

মুসলিমরাও শামিল। আল্লাহ্ বলেনঃ "**. . আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির"।** (সূরা আল- মায়িদাঃ ৪৪)

আয়াতের এ অংশ **"এবং তুমি যদি তাদের ইচ্ছানুযায়ী চল, "** এখানে ইচ্ছা বলতে কি বুঝিয়েছেন?
শায়খ ইউসুফ আল- ইউয়াইরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এখানে ইচ্ছার কথা বলে তারা যা ইচ্ছা করে তা বুঝানো হয়েছে, এবং তাদের অভ্যাসগত কাজ এমনকি তাদের পোশাক পর্যন্ত" , ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, "কুফফাররা তখন খুশি হয় যখন তারা দেখে যে মুসলিমরা তাদের অনুসরণ করছে, এমনকি যদি তা সাধারণ সাজ পোশাকও হয়ে থাকে"।

আজকে এই আয়াতের সত্যতা দেখতে পাই। যখন আমাদের মুসলিম মহিলারা হিজাব পড়ে না, কুফফাররা খুব খুশি হয়, **যদিও এটি পোশাকের একটি বিধি মাত্র** কিন্তু তারা এটা নিয়ে ফ্রান্সে এবং তুরস্কে বড় ধরণের হৈ চৈ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদী পদক্ষেপ সমূহ এবং নারী অধিকার সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলো বিশেষভাবে হিজাবে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। তারা সবসময় এটা নিয়ে কথা বলে এবং একে নির্যাতন হিসেবে দেখে। **যদি পশ্চিমারা সত্যই উদারপন্থী হত, তবে যে কারও ইচ্ছামত পোশাক পড়তে দিত, অতঃপর তারা কেন খৃষ্টান সন্ন্যাসীনীদের পোশাকের বিপক্ষে না থেকে শুধু মুসলিমদের এ বিষয়ের বিরোধাচারণ করে।** কেন আমাদের এই বিধানটি তাদের সবার বেদনা উদ্রেক করে? আমরা দেখি, মেয়েরা যখন রংধনুর সব রং এর পোশাক বা রুচিহীন বা বিকৃত পোশাক পরিধান করে, তারা তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখে। কিন্তু যখনই কোন মুসলিম মহিলা স্বেচ্ছায় শালীন পোশাক পড়তে চায়, তখনই তা তাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ায়। তারা আমাদের পোশাক এবং বাহ্যিক রূপকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

পরাজয়ের দ্বিতীয় অর্থঃ কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেয়া

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ (فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ)

"সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না"। (সূরা আল- ক্বালামঃ ৮)

কুফফারদের আনুগত্য করো না। অতঃপর আল্লাহ্ বলেনঃ (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)

"তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে"। (সূরা আল- ক্বালামঃ ৯)

আমাদের ধর্ম অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় ধর্ম। অনেক ধর্মে কিছু সীমাবদ্ধ আচার অনুষ্ঠানে ধর্মীয় নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। কিন্তু ইসলামে আমাদের যা বলা হয়েছে, আমরা তাই অনুসরণ করি। আমাদের ইসলামের বিধান সমূহ নিয়ে খেলাধূলা করবার মত কোন সুযোগ নেই, কারণ তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছে।

লোকজন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসত এবং আপোষ করতে চেষ্টা করত, কিন্তু সমস্যা হল, **এটা তাঁর দ্বীন নয়। এটা আল্লাহর দ্বীন** তিনি কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারতেন না। যখন কুফফাররা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসল এবং বলল, *"এটা করলে কেমন হয় যে, তুমি **এক দিন** আমাদের প্রভুর উপাসনা কর আর আমরা **এক দিন** তোমার রবের ইবাদত করি"?* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা বলল, "তবে এটা করলে কেমন হয়, আমরা তোমার রবের **এক সপ্তাহ** ইবাদত করি আর তুমি আমাদের প্রভুর **এক দিন** উপাসনা করবে"? তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা বলল, "ঠিক আছে এটা করলে কেমন হয়, আমরা তোমার রবের **এক মাস** ইবাদত করব আর তুমি **এক দিন** আমাদের প্রভুর উপাসনা কর"?

তারা তাদের ধর্ম নিয়ে সবখানে খেলায় লিপ্ত থাকতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরবচ্ছিন্নভাবে না বলে গেছেন। তিনি এ দ্বীন **প্রচার করতে এসেছিলেন, পরিবর্তন করতে নয়।** কিন্তু সমস্যা হল, কিছু মুসলিম নিজেদেরকে আল্লাহর এই দ্বীন নিয়ে খেলাধূলা করার অধিকার দিয়েছে। এ কাজ করার মাধ্যমে তারা ব্যর্থ এবং পরাজিত হয়েছে।

ইউ, এস রিপোর্ট এবং ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউ, এস গভর্নমেন্ট মুসলিম বিশ্বের হৃদয় ও মন জয় করতে কতখানি তৎপর যা *সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের* একটি অখন্ড অংশ। বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধের এই অদৃশ্য অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের মত একই রকমভাবে কতখানি গুরত্বপূর্ণ অথবা তার চেয়ে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এটা প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মুসলিম মৌলবাদীদের সাথে একই সাথে বসতে ও কাজ করতে আগ্রহী, যদি তারা দুটি বিষয় মেনে নেয়ঃ **গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী চলতে রাজী** হয় এবং **সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে তাদের একটি অংশ হিসেবে কাজ** করে।

এটা এমন যে, তারা যেন বলছে, *"যদি তোমরা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করতে রাজী হও, আমরাও তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ব কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করে দেব এবং আমরা তোমাদের সাথে বসতে রাজী আছি এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তোমরা মুসলিম মৌলবাদী"।*

এ ঘটনা প্রমাণ করে, তাদের এমন **খেলা দেখানোর এবং আপোষ করার ক্ষমতা** আছে (যেমনটা মক্কার কুফফাররাও তাদের ধর্ম নিয়ে খেলা করেছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে; এক দিনের সাথে এক দিন, অতঃপর এক সপ্তাহের সাথে এক দিন; অতঃপর এক মাসের সাথে এক দিনের তুলনা করে হলেও তারা চেয়েছিল যেন ইসলামের কিছু অংশ তাদের মত ও পথ অনুসারে হয়ে থাকে)।

তা সত্ত্বেও, অনেক মুসলিম এবং ইসলামিক সংঘটন আছে যারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সাথে একই সাথে কাজ করার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিল। তাদের এই ইসলামিক পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি ছিল যে, তারা *দা'ওয়ার সুবিধার* জন্য এমন করেছে। এগুলো সাধারণ উক্তি ছাড়া আর কিছুই না যা যে কোন উপলক্ষে ব্যবহার করা যায়, এমনকি যদি তা ইসলামিকও হয়। **তুমি কুফফারদের কাছ থেকে কি অর্জন করেছ তা কোন বিষয়ই না। এটা মূল্যহীন। আল্লাহর এমন মানুষের প্রয়োজন নেই যারা নিজ দ্বীন নিয়ে ক্ষমতা এবং সম্মান লাভ করার জন্য কুফফারদের সাথে আপোষ করে।**

এটা কি কোন উপলব্ধি করার বিষয় যে, **মহাবিশ্বের প্রতিপালকের দ্বীনের ক্ষমতার জন্য কুফফারদের পক্ষ থেকে সবুজ বাতির প্রয়োজন?** আল্লাহর ধর্ম শুধুমাত্র তখনই শক্তিপ্রাপ্ত হবে, যখন তা কুফফারদের অপদস্থ করবে। আর এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের বিজয় চান। আল্লাহ্ বলেনঃ **"তিনিই তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যদিও মুশরিরা তা অপছন্দ করে।"** (সূরা ছফঃ ৯)

আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

(يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)

"তারা আল্লাহর নূর তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।" (সূরা ছফঃ ৮)

কুফফাররা পছন্দ করুক বা না করুক, এই দ্বীনই প্রবল হতে যাচ্ছে।

আল্লাহর দ্বীনকে প্রবল করবার জন্য আমাদের তাদের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ারও কিছু নেই। আমরা তাদের দাওয়াহ কবুল করার মুখাপেক্ষী নই। যদি তারা কবুল করে, তবে আলহামদুলিল্লাহ। যদি তারা না করে, এটা আমাদের দোষ নয়। এটা আল্লাহর নির্ধারিত ক্বদর। তাদেরকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরাভূত হতে দাও। আল্লাহ বলেনঃ

(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)

“যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না ও শেষ দিবসেও না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া দেয়”। (তাওবা ২৯)

এটি একটি তাক লাগানো বিষয় যে মক্কার জাহিলিয়া এবং বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের **কি অদ্ভূত মিল** রয়েছে। কুরাইশদের কুফফাররা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বলেছিল, **“আমাদেরকে আমাদের মত ছেড়ে দাও এবং আমরাও তোমাকে তোমার মত ছেড়ে দিব।**

আল্লাহ নাযিল করেনঃ **“আমি তোমাকে অবিচল না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পরতে (ইসরা ৭৪)**

‘মুদাহানা’ এবং ‘মুদারাহা’ এর মধ্যে পার্থক্যঃ

দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনের সাথে আপোষ **বনাম** দ্বীনের স্বার্থে দুনিয়ার সাথে আপোষ

‘মুদাহানা’ বলতে কাফিরদের প্রতি কোমল হওয়া বা আপোষ করাকে বোঝায় যেখানে ‘মুদারাহ’ বৈধ। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? ইবনে হাজ্জার এবং আল কুরতুবী, আল কাযীয়া রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুদারাহ মানে দ্বীনের জন্য দুনিয়ার কিছু কোরবানী করা। উদাহরণস্বরূপ- তুমি কোন কুফফারকে দাওয়াহ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাওয়াত করলে। এখানে তুমি তোমার কিছু দুনিয়া কোরবানী করেছ। কিছু টাকা খরচ করেছ খাবার কেনার জন্য, দ্বীনের জন্য নয়। এটা বৈধ। এটা মুদারাহ।

যা হোক, ধরি তোমার মনিব একজন অমুসলিম এবং তোমার বেতন তার থেকে আসে (যদিও প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর পক্ষ হতে আসে) ধরা যাক, সে তোমার কাছে এল এবং প্রশ্ন করল, ‘জিহাদ বলতে কি বোঝায়’? তুমি কি ব্যাখ্যা করতে পার যে, ‘জিহাদ হল নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং ইসলামে এমন কিছুই নেই যা হিংস্রতাকে সমর্থন করে’। এখানে তুমি তোমার **দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীনের সাথে আপোষ করছ।** এটা বৈধ নয়। এটাই ‘মুদাহানা’। এটাই বিষয় দু’টির মধ্যে পার্থক্য।

পরাজয়ের তৃতীয় অর্থঃ কুফফাদের প্রতি ঝুকে পড়া

আল্লাহ্ বলেনঃ **“আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তারা পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর তবে তারা অবশ্যই বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।** (বনী ইসরাঈলঃ ৭৩)

এবং **“আমি তোমাকে অবিচল না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তে”।** (বনী ইসরাঈলঃ ৭৪)

সুতরাং কুফফারদের প্রতি ঝূঁকে পড়া **পরাজয়ের একটি বিশেষ রূপ।**

আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

(وَلَاتَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُالنَّارُ وَمَالَكُمْمِنْدُونِاللَّهِمِنْأَوْلِيَاءَثُمَّلَاتُنْصَرُونَ)

“আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না, নতুবা আগুন তোমাদেরকে গ্রাস করবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই। এবং কারও মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। সূরা হুদঃ ১১৩

আল্লাহ্ এখানে আমাদেরকে একটি কঠিন সতর্কবাণী দিয়েছেন যে, কুফফারদের দিকে ঝুঁকে পড়া আমাদের জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে।

পরাজয়ের চতুর্থ অর্থঃ কুফফারদের আনুগত্য করা

আল্লাহ্‌ বলেনঃ “. . **তার মনকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে দিয়েছি যে নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালঙ্ঘন করা। আপনি তার আনুগত্য করবেন না।”** সূরা কাহফঃ ২৮

পরাজয়ের পঞ্চম অর্থঃ হতাশ হয়ে পড়া

পরাজয়ের ৫ম অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিজয় তা ত্যাগ করা; আশা হারিয়ে ফেলা। এটা এমন এক মানসিক অবস্থা যা ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা কিভাবে সম্ভব যে, তুমি বিশ্বাস কর আল্লাহ্‌ আল- ক্বাযী, আল- আযীয এবং বিজয়ের আশা ছেড়ে দাও? এটা তো কুফরেরই একটা বৈশিষ্ট্য, এটা তো তারাই সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুফফার) যারা আশা ত্যাগ করে, কিন্তু মুসলিমের কখনোই আশা ত্যাগ করা উচিত নয়। যদি তোমার মানসিক অবস্থা ‘বিজয়ী’র মত হয়, তবে বাস্তবিকই আল্লাহ পাকের তাওফিকে তুমি বিজয়ী হবে। বিজয়ের জন্য আশা পরিত্যাগ এক মস্ত বড় অন্যায়।

আজ কুফফাররা তাদের বিশাল সামরিক বাহিনী ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, তার কারণে অনেক মুসলিমই আজ আশাহত। কিছু মুসলিম আজ মুজাহিদীনদের সাহায্য করা পরিত্যাগ করেছে এই ভেবে যে, *এটা একটা ব্যর্থ কারণ,* তারা তাদের নিজেদেরকেই বলে, *‘কেন আমি আমার টাকা এই মুজাহিদীনদের পিছনে ব্যয় করব? তারা তো কখনও এমন শক্তিধর শত্রু যাদের পারমানবিক অস্ত্র এবং অপেক্ষমান সৈন্য আছে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে যাচ্ছে না’?* কিংবা *‘কিভাবে এই মুজাহিদীনরা জয়ী হবে যখন কুফফারদের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম রয়েছে, অথচ জনগণের কাছে পৌঁছানোর মত মুজাহিদীনদের কোন প্রচার মাধ্যমই নেই?’* এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ধারণাই প্রকাশ করে যে, **তারা আল্লাহ্‌ পাকের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। এই মুসলিমরা বিজয়ের অর্থ বলতে শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিজয়কেই বোঝে এবং তাই তারা আশা ত্যাগ করেছে।**

আমরা দেখেছি যে, শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং **যুদ্ধ করার পূর্বেই আজ এই উম্মাহর অনেকেই পরাজিত** হয়েছে। প্রচার মাধ্যমের যে প্রচারণা এই উম্মাহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তার কারণেই মুসলিমরা আজ কোন চেষ্টার পূর্বেই আশা হারিয়ে ফেলছে। যখন তারা মানসিকভাবেই পরাজিত, তখন তারা সেই পরাজয়ের কোন ইসলামিক তাৎপর্য বের করার চেষ্টা করে। তারা তাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের চেষ্টা করে।

শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ***একজন মুসলিমের কখনই বিজয়ের আশা ত্যাগ করা উচিত না। যদি এই পরাজয় আমরা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে দিই সেক্ষেত্রে আমরা সেই শ্রেষ্ঠত্ব হারাবো যা এমনকি যুদ্ধ***

ক্ষেত্রে পরাজয়ের পরও অক্ষুন্ন থাকে বলে আল্লাহ্ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল 'গাযওয়াতুল উহুদে' যখন আল্লাহ্ নাযিল করলেনঃ

(وَلَاتَهِنُواوَلَاتَحْزَنُواوَأَنتُمُالْأَعْلَوْنَإِنكُنتُممُّؤْمِنِينَ)

"তোমরা হীনবল হয়েও না এবং দুঃখিতও হয়েও না তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও"। সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯

অতএব, যদি আমরা সত্যিই ঈমানদার হবার দাবী করি, তবে বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস হারানো আমাদের জন্য অনুমোদিত নয়।

পরাজয়ের ষষ্ঠ অর্থঃ জিহাদের ব্যানার(আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পতাকা) ছেড়ে দেয়া

জিহাদের পতাকা ছেড়ে দেয়া , অর্থাৎ **হাল ছেড়ে দেয়াও** এক ধরনের পরাজয়। শত্রুরা আমাদের কাছে কি চায়? আমাদের সলাত বা রমাদানে রোযা রাখা নিয়ে তাদের কোন সমস্যা নেই। শত্রুরা যা বন্ধ করতে চায় সেটা হচ্ছে জিহাদ। তারা যা চায় তাই যদি আমরা তাদের দিই, তবে আমরাই হেরে গেলাম। তারা তো এটাই চায়। আজকের দিনে যে কেউ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ করছে না, সে বিনামূল্য শত্রুদেরকে এই বিজয় দিয়ে দিচ্ছে। বহু মুসলিমই বলে থাকে, *"যেই মূহুর্তে কুফফাররা জানতে পারবে যে, কেউ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ করতে চাচ্ছে, তখন থেকেই তাকে সর্বদা নিরীক্ষা করা হবে এবং তার জীবন দুঃসহ করে তোলা হবে"।* কিন্তু এটা কোন অজুহাত হতে পারে না।

যদি তারা আপনাকে সলাত পড়া থেকে বিরত রাখতে চাইত তবে কি আপনি তাদের কথা শুনতেন?
যদি তারা হিজাব পড়া নিষিদ্ধ করে দিত আপনি কি তাদের কথা মেনে নিতেন?

অতএব, জিহাদ আপনি যে রূপেই ছেড়ে দেন না কেন, হোক সেটা আক্বীদা বা ধারণা অথবা অস্ত্রাদি বহন করা বা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ ছেড়ে দেয়া, তবে সেটাই হবে পরাজয়ের একটি নিশান।

পরাজয়ের সপ্তম অর্থঃ সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেয়া

সামরিক জয়ের আশা ছেড়ে দেয়াটাও এক ধরনের পরাজয়। এটা পঞ্চমটার মতই।

পরাজয়ের অষ্টম অর্থঃ শত্রুকে ভয় পাওয়া

মৃত্যুর মত শত্রুকে ভয় পাওয়া, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ রাববুল আলামীন বলেছেন,

"তোমরা কোন অবস্থায়ই তাদের ভয় করবে না বরং আমাকেই ভয় কর যদি তোমরা সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হও"।

আত্- তাঈফা আল মানসুরাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, **"কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করে না"।**
"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী , মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে , যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, **তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।** (মায়িদা ৫৪-৫৬)

সামরিক পরাজয়ের পর কোন মুসলিমের এটা বলা উচিত নয় যে, *"আমাদের পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না"।*

"... সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না আমাকেই ভয় কর"। সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৫

(. . . وَلَايَخَافُونَلَوْمَةَلَائِمٍ . . .)

“. . . এবং তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না. . ”। সূরা আল মায়েদাঃ ৫৪

যদিও এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু ধরে নিই মুসলিমরা তাদের যথাসাধ্য ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে আমরা এ ব্যাপারে শুধু এক দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করব, যদি তুমি তোমার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাক, তবে ফলাফলের জন্য প্রস্তুতির অভাবকে দায়ী করা অন্যায়। কারণ সংখ্যা এবং প্রস্তুতি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অর্থাৎ অস্ত্রসস্ত্র, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বিজয়ের কোন কারণ নয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন,

(لَقَدْنَصَرَكُمُاللَّهُفِيمَوَاطِنَكَثِيرَةٍوَيَوْمَحُنَيْنٍإِذْأَعْجَبَتْكُمْكَثْرَتُكُمْفَلَمْتُغْنِعَنْكُمْشَيْئًاوَضَاقَتْعَلَيْكُمُالْأَرْضُبِمَارَحُبَتْثُمَّوَلَّيْتُمْمُدْبِرِينَ)

“আল্লাহ্ তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশেষ করে হুনায়েনের দিনে সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে সাহায্য করেছিলেন তা স্মরণ করো যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করে দিয়েছিল, অথচ সংখ্যার এ বিপুলতা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিল অতঃপর তোমরা সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এক সময় ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেলে। সূরা আত- তাওবাহঃ ২৫

যখন মুসলিমরা ভেবেছিল তারা সংখ্যায় প্রচুর, এবং তাদের এই স্পষ্ট সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা বিজয়ী হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তারা পরাজিত হয়েছিল। **এটা এক আশ্চর্যের বিষয় যে মুসলিমদের যখনই আমরা সংখ্যায় কম হিসেবে দেখি তখনই তারা জয়লাভ করে আবার যখনই তারা সংখ্যায় অনেক থাকে পরাজিত হয়।** অতএব পরজয়ের জন্য আমাদের কখনই সংখ্যায় কম হওয়াকে দায়ী করা উচিত নয়। ঠিক যেমন- আল্লাহ্I বলেনঃ

“যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত (ওহুদ যুদ্ধের শারিরীক পরাজয়) এসে পৌঁছাল, তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে, (পরাজয়ের) এ বিপদ কিভাবে এলো? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলে; (হে নবী) তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল” । সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৫

অতএব, যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজয়ের কারণ অনেক হতে পারেঃ

- আল্লাহ্ আমাদের পরীক্ষা করতে চান।
- আল্লাহ্ হয়ত আমাদের এর মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করতে চান।
- অথবা আমাদের গুনাহের বা অন্যায়ের কারণেই আমরা পরাজিত হই ।

যাই হোক না কেন, পরাজয় **কখনই সংখ্যা স্বল্পতার জন্য নয়**।
এটা অনুমান করা ভুল হবে যে, আফগানিস্থানের মুজাহিদীনরা বিশ্বের কুফফারদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে তাদের শক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেবল তাদের সংখ্যা ও সরঞ্জামের স্বল্পতার জন্য*। এই অনুমান করাই ভুল, কারণ মুজাহিদীনদের তাদের শত্রুর সমান প্রস্তুতির আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই, বরং আল্লাহ্ চান যেন আমরা আমাদের যথাসাধ্য ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং তা শত্রুর প্রস্তুতির **সমান, বেশি বা অনেক কমও**হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, **"তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য তোমরা যথাসাধ্য সাজসরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখ"।** (সূরা আনফালঃ ৬০)

অতএব, প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা যদি আমাদের শত্রুর ১০% বা ১০০% ও হয় তাই ভাল, **এই সমতার ভিত্তি কখনই এটা নয় যে** আমাদের শত্রুর কি আছে, বরং এই **সমতার ভিত্তি হচ্ছে**আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ, **প্রস্তুতি গ্রহণও যার আওতাভূক্ত** কখনও যদি আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণের সমতা আমাদের শত্রুর এক দশমাংশও হয়, তখনও আল্লাহ্ তাঁর 'শারীয়াহ'- তে যা হুকুম দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ করে থাকলে- **আমরা এরপর কৈফিয়ত হতে মুক্ত** ।

---

*এটা যখন বইটি রচিত হয়েছিল সেই সময়ের একটি কৌশলগত পদক্ষেপ ছিল। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে কুফফাররা ২০১৪ সালের মধ্যেই আফগানিস্তান ত্যাগ করতে চাচ্ছে।

সারসংক্ষেপঃ

চলুন পরাজয়ের ৮টি প্রয়োগকে পুনঃআলোচনা করা যাক-

১. আল- কুফফারদের পদ্ধতির অনুসরণ; এটা হতে পারে ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা, চিন্তাধারা ইত্যাদি।
২. আল- কুফফারদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া; ইসলামের মাধ্যমে আমাদের তাদের অপমানিত করা উচিত এবং তাদের এমন সুযোগ দেয়া উচিত নয় যে, তারা আমাদের সবুজ সংকেত দেবে।
৩. আল- কুফফারদের দিকে ঝুকে পড়া।
৪. আল- কুফফারকে মেনে চলা।
৫. জয়ের প্রতি আশা হারিয়ে ফেলা, এই ধারণা হারিয়ে ফেলা যে, আল্লাহই সর্ব- শক্তিমান এবং যাকে ইচ্ছা তিনি বিজয় দান করে থাকেন বা করতে পারেন।
৬. জিহাদের ঝান্ডা পরিত্যাগ করা। যদি তারা নিষিদ্ধ করে, তবে কি তুমি রোযা পরিত্যাগ করবে?
৭. সামরিক বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করা।
৮. আল্লাহ- কে ভয় করার পরিবর্তে শত্রুকে ভয় করা।

তালিবান এবং উপসংহার

তালিবানরা এমন ক্ষেত্রে শক্তি সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছে, যেখানে অন্য মুসলিমরা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তালিবানরা শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে জানত। যা হোক, তারা এই যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত এজন্যই গ্রহণ করেছে, কারণ তারা অনুধাবন করেছে যে, কি কি অস্ত্র আছে তার উপর কখনই বিজয় নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর করুণার উপর।

আমরা এখানে যেসব আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছি তা ছিল বিজয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ, কারণ এই আদর্শের বিপরীত ধারণা সমূহই এই উম্মাহর আন্তরিক ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্মূল করতে পারে। অতএব, আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে এসব ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

সঠিক উপলব্ধি, মানসিক স্থিরতা ও জিহাদের আক্বীদাই হলো বিজয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং এসব ছাড়া আমাদের জয়ের কোন সুযোগই নেই, কারণ এটা হল 'আক্বীদাগত' যুদ্ধ অর্থাৎ **'সত্যের বিরূদ্ধে মিথ্যা**র লড়াই।

ফলাফলের ব্যর্থতা কখনই ভুল পরিকল্পনা বা ভুল পদ্ধতির নির্দেশ করে না। এটা খুবই সম্ভব যে সঠিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও বিপরীত ফলাফল প্রাপ্তি হয়। আমরা এটা বলতে পারি না যে, যেহেতু আমাদের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি, তাই আমাদের পরিকল্পনাই ভুল। এটা কখনই সঠিক উপলব্ধি নয়।

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি। তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন, আমরা যা শিখলাম তা পালন করার তৌফিক দেন। যেহেতু **শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যই হল তার যথাযথ পালন।** আল্লাহর কাছে আমরা কামনা করি, তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন যারা 'শাহাদা'র পদমর্যাদায় উন্নীত। আল্লাহ্ যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন যারা 'জান্নাতুল ফিরদাউসে' প্রবেশ করে। আল্লাহ্ যেন আমাদের রক্ত, আমাদের প্রচেষ্টাকে রোজ কিয়ামতের দিনে আল্লাহর ও তার রাসূলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আনুগত্যের সাক্ষ্য হিসেবে কবুল করেন। আমীন ইয়া রাববুল আ'লামীন।

পরিশিষ্ট-১

সমর শব্দের বিশ্লেষণ: সমর অর্থ হলো যুদ্ধ , রণ, সংগ্রাম[1] ইংরেজিতে একে বলে War, battle, Combat, Conflict, Fight.

সমর শব্দটির কিছু আরবী প্রতিশব্দ: সমর শব্দের আরবী সমার্থক শব্দ হলো , ১.আল-হারব ২.আল-সীয়ার ৩.নুফুর ৪.খুরুজ ৫.দরব আল-রিকাব ৬.আল-কুওয়াত ৭.রিবাত আল-খায়িল ৮.রাওউন ৯. ওয়াগা ১০. হায়্যাজ ১১. গাযওয়াহ ১২. সারিয়্যাহ ১৩. কিতাল ১৪. জিহাদ।

1. আল-হারব(الحرب) :সমরের একটি আরবী সমার্থক শব্দ। এর অর্থ যুদ্ধ। শব্দটি ধ্বংস , অনিষ্ট, হত্যা, ও কৃতঘ্নতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হারব এর প্রচলিত অর্থে সশস্ত্র সংগ্রামকে বুঝায়। অবশ্য এ সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে সামনাসামনি না হয়েও (আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে) শত্রুর মুকাবিলা। আল-কুরআনে হারব শব্দটি ছ'টি জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।
2. আস-সীয়ার-:(السير) সীয়ার হচ্ছে সীরাহ এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে পন্থা , জীবন চরিত ও পদ্ধতি। আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন , মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জীবন চরিত্র বর্ণনার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা আসার জন্য সীরাহকেও জিহাদের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ (আইন বিশারদ) সীরাহকে মাগাযী (যুদ্ধ) হিসেবে ধরেছেন। অবশ্য কেউ কেউ সীয়ারকে মাগাযী বলেন নি, তবে মাগাযী (যুদ্ধ) ও সন্ধির বিধানগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন চরিত্র আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে।
3. নুফুর—(نفور) : শব্দটি نفر-থেকে নির্গত। এর অর্থ অভিযান। ঘৃণা , বিমুখতা, অনীহা, পালানো , বিক্ষিপ্ত বা পৃথক পৃথক দল , হিজরত, সর্বোপরি এর এক অর্থ অভিযানে বের হওয়া। কালক্রমে এখন শব্দটি যুদ্ধ বা সশস্ত্র অর্থেও ব্যবহৃত হচ্ছে।
4. খুরুজ:(خروج) এর সাধারণ অর্থ বের হওয়া। তবে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়াকেও বুঝায়।

5. দরব আল- রিকাব-:(ضرب الرقاب) এর অর্থ আঘাত। আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়ের অর্থ গর্দানের ওপর আঘাত করা।

6. আল- কুওয়াত :(القوة)এর অর্থ শক্তি। এ শব্দটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থে আল- কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

7. রিবাত আল-খায়িল-(رباط الخيل) : এর অর্থ সীমান্ত রক্ষার জন্য অশ্বারোহী সেনার চৌকি বা ছাউনির ব্যবস্থাকরণ। এ শব্দটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থে আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

8. রাওউন—(روع) : এর অর্থ ভয় বা আতংক। প্রাক ইসলামী যুগ থেকে এ শব্দটি যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

9. ওয়াগা— : (وغي) এর অর্থ শোরগোল গোলযোগ। এ শব্দটি দিয়েও যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে।

10. হায়্যাজ—(هياج) : এর অর্থ ক্রোধ বা আক্রোশ। এ শব্দটিও যুদ্ধ অর্থে সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

11. গাযওয়াহ-(غزوة) : এর অর্থ যুদ্ধ যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

12. সারিয়্যাহ (سرية) :এর অর্থ যুদ্ধ (যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল না)।

13. কিতাল-(قتال) : কিতাল শব্দটির অর্থ মারা, হত্যা, যুদ্ধ, প্রতিশোধ, অভিশাপ, সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রামকে কিতাল বলে। আল-কুরআনে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকারকারীর (কাফির) বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে বুঝানোর (যুদ্ধের অনুমতি বা নির্দেশের) ক্ষেত্রে সাধারণত: قتال - শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত এ আয়াতে: *'তাদেরকে ক্বিতালের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হলো, যারা আক্রান্ত হয়েছে, যাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম' (হাজ্জ ৩৯)* ব্যবহৃত হয়েছে। বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জবাবে নাযিলকৃত আয়াতেও কিতাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিমদের দু'বিরোধী দলের সংগ্রামের পর মীমাংসার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নির্দেশিত আয়াতেও কিতাল শব্দটি প্রয়োগ হতে দেখা গেছে। قتال শব্দটির মূল অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। আল-কুরআনে সশস্ত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে جهاد শব্দটি একবারও ব্যবহার করা হয়নি। মূলত: এখানেই جهاد এবং قتال এর মধ্যে পার্থক্য। আর জিহাদ হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, আর কিতাল হচ্ছে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশক শব্দ। জিহাদ

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরযে আইন, আর কিতাল যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে ফরয। কিন্তু যুদ্ধে অক্ষম মুসলিমদের জন্য তা ফরযে কিফায়া। উদাহরণস্বরুপ দেখুন এই আয়াতটি, ইরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের উপর ক্বিতাল ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না"। (সূরা বাকারাহ ২১৬) এখানে ক্বিতাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

14. জিহাদ-(جهاد): শব্দটি جهد শব্দ থেকে নির্গত। ج- (জিম) বর্ণের ওপর পেশ হলে এর অর্থশক্তি ও সামর্থ্য , কঠিন, অতিরিক্ত, পরিশ্রম। আর জিমের ওপর ফাতাহ হলে এর অর্থ শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা , প্রচেষ্টা, লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো , পরীক্ষা করা, আগ্রহ প্রকাশ করা, ক্ষীণ বা দুর্বল করা, অধ্যবসায় সহকারে কাজ করা , এবং সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। এগুলো হচ্ছে এই আভিধানিক কিংবা শাব্দিক অর্থ। ইসলামী পরিভাষায়, যুদ্ধে দুশমন প্রতিরোধে সব শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করা। তাই জিহাদ হচ্ছে শত্রু দমনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ তথা যুদ্ধ। যা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২

হিজরত বন্ধ হবে না যতদিন না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়

রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ''আর আমি তোমাদের পাঁচটি জিনিসের আদেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেনঃ আল- জামা'আ (ঐক্য), শোনা, মানা, হিজরত এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'' [আহমদ, হারিছ আল আশআরী (রদিয়াল্লাহু আনহু)] এবং তিনি আরো বলেন, ''হিজরত বন্ধ হবে না যতদিন না তওবা বন্ধ হয়। আর তওবা বন্ধ হবে না যতদিন না সূর্য তাঁর অস্ত যাওয়ার দিক দিয়ে উদিত হয়।'' [আবু দাউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত]

বেশ কয়েকটি কারণে হিজরত ওয়াজিব হয় তন্মধ্যেঃ

১. যখন দ্বীনের ওপর ফিৎনার আশংকা থাকেঃ দ্বীন রক্ষা করে মুশরিকদের থেকে নিরাপদে প্রস্থান করা যখন দ্বীনের ওপর ফিৎনার আশংকা থাকে। আর এটাই হল **'দারুল কুফর'** থেকে **'দারুল ইসলাম'** অথবা **'দারুল আমান**'- এ হিজরত করা, যার পক্ষে সম্ভবপর।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ **''সেইসব মুসলিমদের কারো সাথে আমার সম্পর্ক নেই যারা মুশরিকদের ভেতরে অবস্থান করে।''** (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আতা ইবনে আবি বারাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেনঃ আমি উবাইদ ইবনে উমাইর আল লাইছিকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রদিয়াল্লাহু আনহু) - এর সাথে দেখা করি। এরপর আমরা তাদের হিজরতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বললেনঃ ''আজ আর হিজরত নেই, - মু'মিনগণের ভেতরে **যে ব্যক্তির দ্বীনের উপর ফিৎনা আসবে সে যেখানে খুশী আল্লাহর ইবাদত করতে পারে,** তবে জিহাদ এবং এর নিয়্যত ব্যতীত।''

এখানে সঠিক বক্তব্য হলোঃ এখানে সায়্যিদা আয়েশা (রদিয়াল্লাহু আনহু) যে হিজরতের কথা বলেছেন তা হলো 'দারুল ইসলাম' থেকে হিজরত। কারণ তিনি বলেছেন, **''আজ আর হিজরত নেই'',** যখন তিনি 'দারুল ইসলামে' ছিলেন। এরপর তিনি হিজরতের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তা হলো ফিৎনা থেকে দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য পলায়ন করা।

২. হিজরত আল্লাহর পথে জিহাদের সূচনা স্বরূপঃ হারিছ আল আশআরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) - এর হাদীস- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ''আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেনঃ আল জামা'আ, শোনা, মানা, হিজরত এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'' (আহমাদ)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **''যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য্যধারণ করে, তোমার রব এই সবের পরে, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।''** (সূরা নাহল ১৬: ১১০)

সুতরাং হিজরতই সর্বশেষ স্তর নয়। বরং এটি জিহাদের একটি সূচনা স্বরূপ। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **''হিজরত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ চলবে''** [আহমাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে সাদী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত]

এই গ্রন্থের শুরুতেই আমি আলোচনা করেছি যে, ঈসা ইবনে মরিয়াম (আঃ) এসে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ বলবৎ থাকবে। আর এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে এটাই হবে আল্লাহর রাস্তায় সর্বশেষ জিহাদ। এই হিজরত হবে জিহাদের সূচনা স্বরূপ যা অন্য কোন দেশের জিহাদরত মুসলিম মুজাহিদীনদের সহায়তা করতে পারে অথবা মুসলিমদের জিহাদে প্রস্তুতি নেয়ার নিয়্যতে এবং লোক সমাগমের উদ্দেশ্যে যেন মুসলিমরা তাদের দেশে ফিরতে পারে জিহাদের জন্য তৈরী হয়ে।

অন্য এলাকায় হিজরতের হুকুম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) ***"হিজরত সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলেনঃ আর এটি হলো 'দারুল কুফর' ত্যাগ করে 'দারুল ইসলামে' আসা"-***

আল্লাহ্ বলেছেনঃ **"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের জীবনের প্রতি যুলুম করেছিল, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করতে গিয়ে বলবেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম; তারা বলবেঃ আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তন্মধ্যে হিজরত করতে? অতএব তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান"।** (সূরা নিসা ৪: ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, **"সেইসব মুসলিমদের কারো সাথে আমার সম্পর্ক নেই যারা মুশরিকদের ভেতরে অবস্থান করে।"** (আবু দাউদ, তিরমিযী) আর এগুলো ছাড়াও আরো যেসব আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা অনেক। এটি বন্ধ হবে না।

কিছু লোক বলে যে, হিজরত আর নেই কারণ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **"ফাতেহ মাক্কার (মক্কা বিজয়ের) পর আর হিজরত নেই"।** এবং তিনি বলেনঃ **"জিহাদ ও নিয়্যত ছাড়া অন্য সকল হিজরত বন্ধ হয়ে গেছে"।**

বর্ণিত আছে যে, যখন মারওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম কবুল করেন, তাকে বলা হয়েছিল, তার জন্য কোন দ্বীন নেই যে হিজরত করে না। সুতরাং তিনি মদীনায় চলে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কিসে তোমাকে এখানে আনলো, হে আবু ওহাব" সে বলল, ***"একথা বলা হয়েছে যে তার জন্য কোন দ্বীন নেই যে হিজরত করে না"।*** তিনি বললেন, ***"ফিরে যাও আবু ওহাব, মক্কার বিস্তৃত উপত্যকায় এবং তোমার গৃহেই থাকো, কারণ হিজরত তো শেষ হয়ে গেছে শুধুমাত্র জিহাদ ও নিয়্যত ছাড়া"।*** এই পুরোটাই সাঈদ থেকে বর্ণিত।

আর মুআবিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছেঃ আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে বলতে শুনেছি, ***"হিজরত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সূর্য তার অস্ত যাওয়ার দিক থেকে উদিত হয়"-*** আবু দাউদের বর্ণিত।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ***"হিজরত বন্ধ হবে না যতদিন জিহাদ থাকবে"।*** [সাঈদ অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত]।

সমন্বয় সাধনঃ আর এসকল আয়াত ও হাদীসের সার্বজনীনতা থেকে বোঝা যায় যে,
হিজরতের কারণ সমূহের মতো, সকল সময়েই হিজরত আবশ্যক।
পূর্বের হাদিসটি যেখানে তিনি মক্কা বিজয়ের পরে হিজরত না থাকার কথা বলেছেন যে, বিজিত দেশ থেকে হিজরত নেই।

আর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাকে তিনি যে হিজরত শেষ হওয়ার কথা বলেছেন, তা হলো মক্কা থেকে হিজরত, কারণ (সাধারণভাবে) হিজরত হলো কাফিরদের দেশ থেকে বাহির হওয়া। সুতরাং এটি যদি (ইসলাম দ্বারা) বিজিত হয়, তাহলে তা আর কাফিরদের দেশ থাকে না, সুতরাং এটি থেকে হিজরত করার কোন প্রয়োজন নেই। আর ***একইভাবে প্রত্যেকটি দেশ যেটি দখল করা হয়েছে তা থেকে আর কোন হিজরত নেই, বরং তার দিকেই হিজরত করতে হয়।***

যখন স্পষ্ট হয়ে গেল কিয়ামত পর্যন্ত হিজরত চলবে তখন জানতে হবে মুহাজিরদের প্রকারভেদ সম্পর্কে। মুহাজির তিন প্রকারেরঃ

প্রথমতঃ যার ওপর হিজরত ওয়াজিব এবং সে এ ব্যাপারে সক্ষম।
যখন সে তার দ্বীন প্রকাশ করতে পারে না, বা যখন সে দ্বীনের হুকুম মানতে পারে না অথবা যখন সে কাফিরদের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং এই ব্যক্তির ওপর হিজরত ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের জীবনের প্রতি যুলুম করেছিল ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করতে গিয়ে বলবেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম তারা বলবেঃ আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তন্মধ্যে হিজরত করতে? অতএব তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান"। (সূরা নিসা ৪: ৯৭)

আর এটা সত্যিই একটি ভয়াবহ হুমকি, যা হিজরত এর আবশ্যকতা তুলে ধরে। এটা এই কারণেই যে প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য 'দারুল কুফর' থেকে হিজরত করা অবশ্য করণীয়। আর হিজরত হলো এসব আবশ্যক প্রয়োজনসমূহের একটি, যা এগুলোকে পরিপূর্ণতা দেয়, এবং যা ছাড়া হুকুমসমূহ পালন করা সম্ভব নয়; সুতরাং এ বিষয়টিও ওয়াজিব।

দ্বিতীয়তঃ যার ওপর হিজরত ওয়াজিব নয়। যে হিজরত করতে সক্ষম নয়- অসুস্থতার কারণে, অথবা সেখানে থাকতে বাধ্য হলে অথবা তার স্ত্রী সন্তানদের বা অনুরূপের (শারীরিক) দুর্বলতার কারণে।

আল্লাহর আয়াতঃ "**কিন্তু পুরুষ নারী ও শিশুদের মধ্যে অসহায়গণ ব্যতীত যারা কোন উপায় করতে পারে না বা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না। ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল"।** (সূরা নিসা ৪: ৯৮-৯৯) আর এক্ষেত্রে হিজরতকে উত্তম বা সুপারিশমূলকও বলা যাবে না কারণ, এটি সম্ভব নয়।

এবং **তৃতীয়তঃ** সেই ব্যক্তি যার জন্য এটি প্রশংসনীয় কিন্তু ওয়াজিব নয়।
ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি হিজরত করতে সক্ষম আবার প্রকাশ্যে তার দ্বীন পালনেও সক্ষম। সুতরাং দারুল কুফরে তার বসবাসে ইতি টানা প্রশংসনীয় হবে যাতে সে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম হয় এবং মুসলিমদের সংখ্যা বাড়াতে পারে এবং তাদের সাহায্য করতে পারে। সেই সাথে কাফিরদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের কুকর্মের সাক্ষী হওয়া থেকেও রেহাই পায়। কিন্তু এটি তার ওয়াজিব নয় কারণ সে হিজরত না করেই সেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে সক্ষম।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর চাচা আল আববাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) তার ইসলামে

থাকাকালীন মক্কায় অবস্থান করেছেন। নু'আইম আন নুহাম যখন হিজরত করতে চান তখন তার কওম বনু আদি তার কাছে এসে বলে, *'আমাদের সাথে থাকুন, আপনি আপনার দ্বীনের ওপর থাকবেন এবং তাদের থেকে আপনাকে রক্ষা করবো যারা আপনার দ্বীনের ওপর থাকবে না এবং তাদের থেকে আপনাকে রক্ষা করব যারা আপনার ক্ষতি করতে চায়। আমাদের জন্য দায়িত্বশীল থাকুন যেভাবে আপনি (বর্তমানে) আমাদের প্রতি দায়িত্বশীল আছেন'।* আর তিনি বনু আদির ইয়াতিম ও বিধবাদের দেখাশোনা করতেন।

সুতরাং তিনি কিছুদিন হিজরত থেকে বিরত থেকে পরবর্তী সময়ে হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ "তোমার কওম তোমার প্রতি তার চেয়ে উত্তম যেমনটি ছিল আমার কওম আমার প্রতি। আমার কওম আমাকে বহিষ্কার করে এবং আমাকে হত্যা করতে চায় এবং তোমার কওম তোমাকে রক্ষা করে এবং (ক্ষতি থেকে) বাচায়। তখন তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ', আপনার কওম তো আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের দিকে বহিষ্কার করেছে। আর আমার কওম আমাকে হিজরত ও আল্লাহর আনুগত্য থেকে আটকে রেখেছে। অথবা এর কাছাকাছি কোন বক্তব্য"।

উৎসঃ (আল মুগনি ওয়াশ শারহ্ আল কাবীর)
সৌজন্যেঃ বাব-উল-ইসলাম

পরিশিষ্ট-৩ .

মোল্লা মুহাম্মদ ওমর (আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন) এর চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
প্রশংসা সেই মহান রব আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি তাঁর কিতাবে মর্মকথাটি বলেছেন,

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার"। (সূরা তাওবা ৪১)

এবং যিনি বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।

যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান"। (সূরা তাওবা ৩৮-৩৯)

আর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুজাহিদগণের ইমাম, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি বলেছেন, "আমি শেষ সময়ের পূর্বে তরবারী হাতে সম্মুখে প্রেরিত হয়েছি, যেন একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো উপাসনা না করা হয়, শরীক বিহীন অবস্থায়। আর আমার রিযিকের স্থান হয়েছে আমার বর্শার নিচে, আর যে আমার আদেশের অমান্য করে তার প্রতি নীচতা এবং সম্মানহানিতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর যে কেউ কোন জাতির অনুসরণ করে সে তাদের একজন হয়ে যায়" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

অতঃপর,

তাই হে মহান মুসলিম জাতি,
“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।
তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে”। (আলে ইমরান ১১০)

হে মুসলমানেরা যারা আছেন দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে কিংবা পশ্চিমে,
আপনারা যারা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করেছেন; হে সব মুসলমানেরা নিসন্দেহে আপনারা অবগত আছেন এবং মনোযোগের সাথে অনুসরণ করছেন সুস্পষ্ট ক্রুসেডারদের আক্রমণ যার নেতৃত্বে আছে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা, আর এদের আন্তর্জাতিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে ব্রিটেন, ইউরোপের খ্রিস্টান দেশগুলো, ন্যাটো, রাশিয়া এবং প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশগুলো, এবং আরও তাদের সাথে যে সকল কুফরের দল যুক্ত হয়েছে, মুরতাদ ও নির্বোধ মুসলিমদের কেউ কেউ, সমরসাজে সজ্জিত করেছে তাদের সামরিক বাহিনীকে, আর তাদের দলবল নিয়ে সমবেত হয়েছে আফগানিস্তানের ইসলামিক রাষ্ট্রের (ইমারাত) বিরুদ্ধে, তাদের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যার মূল হল আফগানিস্তানের ইসলামিক সরকারকে বিলুপ্ত করা, আর তারা যা বলে অর্থাৎ তাদের ভাষায় “সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিগুলো” নির্মূল করা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আপনারা বুঝতে পারেন সেই কারণগুলো যা তারা তাদের ক্রুসেড আক্রমণের আড়ালে দাবী করে আসছে তাদের পূর্বানুমিত লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর মহান গ্রন্থে তাদের এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিয়েছেন, “বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে”। (সূরা বাকারাহ ২১৭)

তারা এই ইসলামিক রাষ্ট্রকে মুছে দিতে চায়, কারণ এটা ইসলামিক, অন্যথায়, কোন আইন কিংবা সভায় কি এর অনুমতি রয়েছে যে কাউকে কেবলমাত্র সন্দেহবশত কিংবা নিছক কোন অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া হবে অথচ সেই অভিযোগ প্রমাণিত নয়, আর একজন লোকের জন্য একটি জাতিকে শাস্তি দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না ! আল্লাহর আইন কিংবা মানব রচিত মিথ্যা আইন যেটাই হোক না কেন, এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত যে একজন লোকের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় তবে সেই অভিযোগ প্রমাণিত করার আগ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি

নির্দোষ। কিন্তু তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা একটি স্বাধীন, কারো উপর নির্ভরশীল নয় এমন একটি ইসলামিক সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, আর এটাই, বাস্তবে, তাদের বেশি জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, নিউ ইয়র্ক কিংবা ওয়াশিংটনের আক্রমণের থেকেও।

হে দুনিয়ার সর্বত্র বিরাজমান মুসলমানেরা,

আজ আর সেই প্রশ্নের উত্তর কেউ জানতে আগ্রহী নয় যে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল তা সঠিক না ভুল ছিল, কারণ যা হয়েছে তা তো হয়েছেই, যারা এর সমর্থন করার ছিল তারা করেছে আর যারা বিরোধীতা করার ছিল তারাও করেছে !! আজকে যে প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা হল, 'মুসলিম উম্মাহর কি দায়িত্ব রয়েছে তাদের আফগানিস্তানের ভাইদের প্রতি যারা নব্য ক্রুসেডারদের আক্রমণের শিকার? কিংবা তাদের ব্যাপারে কি হবে যারা নিজেদেরকে ক্রুসেডারদের সাথে মিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে এবং যে কোন সাহায্য সহযোগিতায় তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে?"

মুসলিম উম্মাহর এই বিষয়ে সর্বসম্মত মতামত বা ইমামগণের ইজমা হল, আজকে আমরা যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় প্রতিটি মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয কর্তব্য হল এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। পুত্রের প্রয়োজন নেই পিতার অনুমতির, দাসের দরকার নেই মনিবের, কিংবা স্বামীর জন্যে জরুরী নয় তার স্ত্রীর এমনকি একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে ঋণদাতা ব্যক্তির কাছ থেকে পর্যন্ত অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আর এই ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এই বিষয় হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সম্পর্কে এবং মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে। আর যারা তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছে, কিংবা তাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পরিষ্কার করে তাঁর কিতাবে ঘোষণা দিয়েছেন, "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে"। (সূরা মায়িদা ৫১-৫২)

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ সুবহানহু ওয়া তায়ালা একাধিক বিষয়ে পরিষ্কার করে বলেছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

১ ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, তাদের সহায়তা কিংবা তাদের কলেবর বৃদ্ধি করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।
২ যে তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে, সহায়তা করে এবং কলেবর বৃদ্ধি করে , তখন তার প্রতি ইহুদী খ্রিস্টানদের মতন একই বিধান আরোপিত হবে।
৩ আর তাদের সাথে মৈত্রী হল মুনাফিকদের একটি চারিত্রিক স্বভাব এবং তাদের অভ্যাস।
আর তিনি মহামহিম, পরিষ্কার করে বলেছেন, মুশরিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তাদের সাহায্য করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনীত ঈমানকে বাতিল করে দেয়, তিনি আল্লাহ্ বলছেন, "আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না"। (সূরা মায়িদা ৮০-৮১)

এই সকল আয়াতসমূহ কিংবা অন্যান্য সহায়ক আয়াতসমূহ থেকে আলেমগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে সংযুক্ত হওয়া হচ্ছে একজন মুসলমানের ঈমান ভঙ্গের কারণ এবং যে সকল কারণে একজন মুসলমান কাফেরে পরিণত হয়ে থাকে সেগুলোর একটি এবং সেই ব্যক্তির উপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করা হবে এবং সে মুসলিম উম্মাহ কিংবা মিল্লাতের কেউ নয়।

হে মহান দীন ইসলামের আলেম সমাজ, আর হে ইসলামের দায়ীগণ !
আপনাদের প্রথম কর্তব্য হল সর্বত্র সাধারণের মাঝে এই সত্যকে উন্মুক্ত করা, এই বাস্তবতাগুলো সবার সাথে আলোচনা করা, আল্লাহ্র ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে ভীত হবেন না কারণ আল্লাহ্র সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এই কাজের ওয়াদা করা হয়েছে, তিনি আল্লাহ্ বলছেন, "আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা "। ইমরান ১৮৭

কাজেই সাধারণ মানুষের মাঝে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আর তাদের উত্তেজিত করুন ক্বিতালের জন্যে যেভাবে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি আল্লাহ্‌ আদেশ করেছেন, "হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন ক্বিতালের জন্য"। আনফাল ৬৫

হে সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীগণ,
আপনাদের প্রথম কর্তব্য হল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা, তিনি আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বলছেন, "আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত"। **১১১** তাওবা

এবং তিনি বলেছেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ"। বাকারাহ ২৬১

আর হে ইসলামের যুবক পুরুষেরা,তোমাদের প্রথম দায়িত্ব হল জিহাদ, এর প্রস্তুতি এবং বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দেয়া, কারণ তিনি মহামহিম বলছেন, "... মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক"। তাওবা ৫

হে মুসলমানেরা যে যেখানে আছো,জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, " আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর লড়াই করতে থাকবে..." এবং বাক্যাংশটি এই " হকের উপর লড়াই"... "যারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কিংবা বিরোধীতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না যে পর্যন্ত না কিয়ামত এসে উপস্থিত হয়"...(ইমাম মুসলিমের বর্ণনা)
তাই এই হাদীস লোকদেরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে,
১ বিজয়ী দলঃ এরা হচ্ছেন সেই লোক লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং একে প্রতিষ্ঠিত করছেন ও লড়াই করছেন
২ বিভ্রান্ত দলঃ এরা হচ্ছে ইহূদী ও খ্রিস্টানেরা, কুফর ও মুরতাদেরা এবং মুসলিমদের মাঝে কিছু নির্বোধেরা
৩ বিশ্বাসঘাতক দলঃ তারা হচ্ছে যারা মুসলিমদের দলকে সাহায্য করা থেকে বিরত থেকে ঘরে বসে আছে এবং তাদের এই অবস্থানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে লোকদের কাছে উপস্থাপন করছে।

এবং এগুলো ছাড়া আর কোন দল নেই, কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হল নিজেকে মিলিয়ে দেখা যে সে কোন দলে অবস্থান করছে। এই হাদীসে আরো একটি তথ্য প্রদান করা হয়েছে যে, এই বিজয়ী দলটির কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না যারা এর বিরোধীতা করছে মুশরিকদের মধ্য হতে, কিংবা যারা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে নিজেদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত দাবী করে। আর আমরা এর বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত কারণ এর প্রতিশ্রুতি স্বয়ং রব আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে প্রদান করেছেন, আর তা ধ্বনিত হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্ঠে। কিন্তু এই বিজয়ের আগমনের শর্ত হিসেবে আছে আমরা কিভাবে এবং কতটুকু আন্তরিকতার সাথে নিজেদেরকে আল্লাহ্র দীনের সাথে সংযুক্ত করব, তিনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন, “আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর”। হাজ্জ ৪০

এবং তিনি বলেছেন, “হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন”। মুহাম্মদ ৭

আর যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের বিজয় দান করবেন, না আমেরিকা আর না তাদের মিত্ররা, আর না তাদের সমর্থকেরা, কেউ আমাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি আল্লাহ্ বলছেন, “যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না”। ইমরান ১৬০

তাদের ক্ষমতার দম্ভ যতই হোক না কেন, যতটুকু শক্তি আমেরিকা এবং তাদের মিত্রদেরকে দান করা হয়েছে তা আল্লাহ সর্ব শক্তিমানের তুলনায় কিছুই নয়। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ বলছেন, “আর কাফেররা যেন একা যা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে ...” আনফাল ৫৯-৬০

এবং তিনি মহামহিম বলছেন, “সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল”। নিসা ৭৬

তাদের যুদ্ধোপকরণ কিংবা সৈন্যসংখ্যা আমাদের ভয় দেখাতে পারে না, কারণ আমরা হলাম আল্লাহ্র সৈনিকদের

অন্তর্গত, জুনদুল্লাহ, আল্লাহ্ বলছেন, “নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। ফাতহ ৪

কুফফারদের অর্থনৈতিক কাঠামো কিংবা এর বাহ্যিক চাকচিক্যে আমরা ভীত নই কারণ, “ভূ ও নভোমন্ডলের ধন-ভান্ডার আল্লাহরই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না ”। মুনাফিকুন ৭

এবং তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট দেখে আমরা ভয় পাই না, কারণ আল্লাহ্ বলছেন, “নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ , যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে”। আনফাল ৩৬

এবং আরো জেনে রাখুন, আমেরিকান প্রতিরক্ষা বাহিনীর অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আমাদেরকে আল্লাহর সাহায্য লাভ থেকে বিরত করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, “তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব , হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর”। হাশর ২

এবং তিনি বলেছেন, “কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর , ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান”। আহযাব ২৬-২৭

আর তাই হে মুসলিমেরা !

আল্লাহ্র সাহায্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো, যার প্রতিশ্রুতি তিনি আমাদের দিয়েছেন, আল্লাহ্ তার ওয়াদা পূরণে কখনো ব্যর্থ হন না। “আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সাম র্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে,   যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত"। হাজ্জ ৪০-৪১

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
আমির আল-মুমিনিন
মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ
১৬-৭-১৪২২ হিজরী

অনুলিখনঃ
হুসাইন বিন মাহমুদ
৩০ জিলকদ, ১৪২৬

পরিশিষ্ট-৪ । English Lectures on this Book.

ছাওয়াবিত 'আলা দারব আল জিহাদ
জিহাদের পথে যত চিরস্থায়ী, ধ্রুবক

Thawaabit 'ala darb al Jihad is one of the best contemporary books on the subject of Jihad. It was written by Shaykh Yusuf al 'Uyayree. Shaykh Yusuf had left at an early age to fight in Afghanistan against the Russians. People who knew him described him as a very intelligent individual who was well-versed in all of the weaponry in all fields and was able to train with them very well. Later, he returned to the Arabian Peninsula where he continued serving the Mujahideen in Chechnya and fundraised for them. As time passed, he was arrested and put in jail for a few years. In jail he memorized al Bukhari and Muslim. When he came out, he wrote a few books; each one of them is a masterpiece. One can see the depth of his textual references to Qur'an and Sunnah as well as references to present day occurences. He was later killed and died shaheed by the security forces in the Arabian Peninsula; we ask Allah for that to be the case.

Download 1 **কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে**
Download 2 **জিহাদ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল নয়**
Download 3 **জিহাদের নির্দিষ্ট কোন স্থানের উপর নির্ভর করে না**
Download 4 **জিহাদ কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধ ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল নয়**
Download 5 **বিজয় শুধু সেনাবাহিনীর বিজয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়**
Download 6 **পরাজয়ের সংজ্ঞা**

পরিশিষ্ট-৫

মাশারী আল-আশউয়াক্ব ইলা মাশারী আল-উশাক্ব

=================
About the author
==================
The author’s full name was Ahmad Ibrahim Muhammad al-Dimashqi al-Dumyati, commonly known as Ibn an-Nuhaas and he died in the Year 814 Hijri, corresponding to the Year 1411 of the Gregorian calendar.

Al-Sakhawi said about him: “He was eager to do good, preferred living in obscurity and showed no arrogance or pride due to his knowledge. Whoever would see him would think that he was a commoner – a handsome man, with a beautiful beard, short and medium built. He spent most of his life stationed in Jihad until he died as a martyr.”

Ibn al-Imad said about him: “The Sheikh, Imam, scholar and exemplar.”

In 814 Hijri the Romans attacked the people of Teenah in Egypt. The people of Dumyat, led by Ibn an-Nuhaas went to join their brothers in their fight against the invading forces. Ibn an-Nuhaas was killed in the battle, whilst facing the enemy and not fleeing from them, nine months after he completed writing this book.

=================
About the book
=================

Sheikh Abdullah Azzam said about this book: “This is the best book on Jihad.”

It is considered the most comprehensive study on the subject of Jihad because it was written by an author who practised, lived and experienced what he preached.

Syed Qutb said: “Indeed our words will remain lifeless, until we die in pursuit of those words, then those same words will be brought to life and live amongst the people, inspiring them and bringing their hearts to life.”

===================
Download Lectures (ENGLISH)
===================

- CD01 – ইসলামে জিহাদ, এর ভাষাগত ও শরীয়াহগত অর্থ Download
- CD02 – জিহাদের আদেশ এবং যারা তা পরিহার করে তাদের জন্য হুঁশিয়ারি Download
- CD03 – যারা পিছনে পড়ে থাকে তাদের জন্য উপদেশ Download
- CD04 – জিহাদে উৎসাহ দানের মর্যাদা Download
- CD05 – রিবাত তথা মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা Download
- CD06 – আল্লাহর রাহে আহত হবার মর্যাদা Download
- CD07 – দ্বন্দযুদ্ধ Download
- CD08 – জিহাদের নিয়ত Download
- CD09 – শহীদের মর্যাদা Download
- CD10 – রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধসমূহ Download
- CD11 – সাহাবাদের অভিযান, মুতার গাযওয়া, কোর্স সমাপ্তি Download

========================
Download E-Book
========================

Mashari Al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq (বাংলা) **Download**

Mashari Al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq (English Revised Edition) **Download**

জিহাদের পথে
যা কিছু অপরিবর্তনীয়
শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরী রাহিমাহুল্লাহ